Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue 53
January–March, 2018

# জীবনের মর্যাদা, আত্মঘাতী হামলা ও ইসলাম: একটি পর্যালোচনা

# Dignity of Life, Suicide Attack and Islam: An Analysis

Md. Shohidul Islam*
Abu Talib Mohammad Monawer**

**ABSTRACT**

*Suicide attack is a globally increasing phenomenon. Though ideological and religious influences are some core factors for this, religion, especially Islam is seen to be mainly responsible, which creates misconceptions about Islam and hinders the normal life of Muslims. In order to overcome this problem, a discussion on whether Islam supports suicide attack is required. This paper in adopting an analytical method, tries to explore the position of Islam concerning suicide attack. The paper shows that Islam envisions the highest level of human dignity and legislates various rulings in this regard, and even for the sake of saving one's life while necessary, it lightens the obligatory worships and licenses the prohibited. Islam compares killing of Muslim with the rejection of faith- kufr and considers it among the biggest sins. In addition, the paper also proves that martyrdom and suicide attack are totally different both in circumstances and principles. Suicide attack directly contradicts sharī'ah objectives as it violates the most basic human right. Finally the study suggests that the families, institutions, masjids and the government should play their role together to protect the society from suicide attack.*

**Keywords**: human dignity, suicide attack, Islam.

* Executive Director (in-charge), Bangladesh Islamic Law Research & Ligal Aid Centre, Dhaka, email: hasan8853@yahoo.com

** Abu Talib Mohammad Monawer is a PhD Researcher, Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia, email: monawer.azhar@gmail.com



**সারসংক্ষেপ**

*আত্মঘাতী হামলা ক্রমবর্ধমান একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। এ সমস্যার আদর্শিক ও ধর্মীয় প্রভাবসহ বিভিন্ন কারণ থাকলেও ধর্মকে বিশেষত ইসলামকেই বেশি দায়ী করা হচ্ছে। ফলে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে এবং মুসলিমদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ সমস্যার উত্তরণে ইসলামের সাথে আত্মঘাতী হামলার সম্পর্কের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। অত্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মঘাতী হামলাকে ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা। প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হাসিলে গবেষণার বিশ্লেষণ পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম মানব জীবনকে সর্বাধিক মর্যাদা দিয়েছে এবং এ সম্পর্কিত অসংখ্য বিধিনিষেধ নির্ধারণ করেছে; এমনকি জীবন বাঁচানোর তাগিদে বিভিন্ন ইবাদতের মধ্যে রুখসাতের বিধান রেখেছে এবং প্রাণ রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টাকে ফরয করেছে। আত্মঘাতী হামলা একটি বহুবিধ হত্যাকাণ্ড হওয়ায় ইসলাম একে কুফরি হিসেবে আখ্যা দিয়ে সর্বোচ্চ কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করেছে। উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শাহাদাত ও আত্মঘাতী হামলা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আত্মঘাতী হামলা মানুষের সর্বোচ্চ মৌলিক অধিকারকে ব্যাহত করে এবং শরীয়ার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। পরিবার, শিক্ষাঙ্গন, মসজিদ ও রাষ্ট্র মিলে সমন্বিত পদক্ষেপ নিলে আত্মঘাতী হামলা প্রতিরোধ হতে পারে।*

**মূলশব্দ:** জীবনের মর্যাদা, আত্মঘাতী হামলা, ইসলাম।

## ভূমিকা

আত্মঘাতী হামলা একটি মানবতা বিরোধী অপরাধ। বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই আত্মঘাতী হামলার ঘটনা ঘটছে। তাই এটি একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপ নিয়েছে। শাওল শাইয়ের মতে, সর্বপ্রথম আত্মঘাতী হামলা সংঘটিত হয় দশম শতাব্দীতে শী'আ হাশ্‌শাশীন সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে। অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে এশিয়ার মানুষেরা পাশ্চাত্যের দখলদারদের নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে তাদের বিরুদ্ধে এই আত্মঘাতী হামলার পথ বেছে নেয়। আধুনিক যুগের প্রথম আত্মঘাতী হামলা সংঘটিত হয় ১৯৮৩ সালে লেবাননে। সর্বমোট ৫০টি আত্মঘাতী হামলার ঘটনা ঘটে লেবাননে। এর অর্ধেক সংখ্যক হামলা ঘটে সেক্যুলার সংগঠন, কমিউনিস্ট পার্টি, সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃত্বে এবং বাকি অর্ধেক হামলা সংঘটিত

হয় লেবাননের মুসলিম দল কর্তৃক। তবে পরবর্তীতে লেবাননে এমন হামলার পরিমাণ অনেক কমে যায়। পক্ষান্তরে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে আত্মঘাতী হামলা দিন দিন বাড়তেই থাকে। বিচ্ছিন্নতাবাদী তামিল সংখ্যালঘু সংগঠন তাদের স্বাধীনতার জন্য শ্রীলংকাতে সংখ্যাগুরু সিনহালিজ গ্রুপের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী হামলা ঘটায়। আরেকটি সেক্যুলার সংগঠন ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে তুরস্কে মোট ১৬টি আত্মঘাতী হামলা পরিচালনা করে, যাদের অধিকাংশ ছিল মার্কসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কুর্দি, যদিও এর সদস্যরা নামে মাত্র মুসলিম হিসেবে পরিচিত ছিল (Shay, 2017)। পরবর্তীতে বহু আত্মঘাতী গ্রুপ ও সন্ত্রাসী সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে এবং গোটা বিশ্বব্যাপী এই হত্যাকাণ্ড দিন দিন বেড়েই চলছে (Shay, 2017)। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এসব গ্রুপ ও সংগঠন সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে এবং মানুষের নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।

আত্মঘাতী হামলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও মানসিকসহ বিভিন্ন কারণ রয়েছে। (Ginges, Hansen and Norenzayan 2009; Al-Ḍamūr 2010, 8-9, Arafat 2017; Ara, Uddin; and Kabir 2016) কিন্তু সম্প্রতি আত্মঘাতী হামলার ভয়াবহতা ধর্মকে লক্ষণীয়ভাবে স্পর্শ করছে। গবেষণায় আত্মঘাতী হামলার সাথে ধর্মের কিছুটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। বিশ্বের প্রধান ছয় ধর্মের অনুসারীদের মাঝে চালিত এক সমীক্ষায় বেরিয়ে এসেছে, যারা বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় সহযোগিতামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে তাদের সাথে আত্মঘাতী হামলার ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু মুসলিমদের মাঝে যারা নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে অংশগ্রহণ করে, তাদের সাথে আত্মঘাতী হামলার সম্পর্ক নেই (Ginges, Hansen and Norenzayan 2009)। এতে প্রমাণিত হয় যে, শুধু ইসলামের মূলধারায় যারা একনিষ্ঠ, তাদের আত্মঘাতী হামলার সাথে কোন রকম সম্পর্ক নেই।

কোন কোন লেখক আধুনিক যুগের আত্মঘাতী হামলার মূলে একমাত্র ধর্মীয় উগ্রবাদকে দায়ী করেন। আবার কেউ যে কোন সন্ত্রাসী হামলাকে যে কোন উপায়ে শুধু ইসলামের সাথে সম্পর্কিত করেন। এমন প্রচারণা এক দিকে ইসলামের অনুসারীদেরকে দোষারোপ করে বিভিন্ন রকম ভোগান্তিতে ফেলে দিচ্ছে; অন্য দিকে সাধারণ মুসলিম, নওমুসলিম এবং ইসলাম গ্রহণ করতে ও জানতে আগ্রহীদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে ফেলা হচ্ছে। সর্বোপরি মুসলিমসহ অন্যদেরও সাধারণ জীবন যাপনের নিরাপত্তা বিঘ্ন হচ্ছে। এজন্য মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় উৎসের আলোকে আত্মঘাতী হামলার মূল্যায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। অত্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আত্মঘাতী হামলাকে ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা। প্রবন্ধের তথ্য সংগ্রহে শুধুমাত্র ইসলামের প্রধান চার উৎস কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস এবং সমকালীন



গবেষণাকর্ম তথা একাডেমিক অভিসন্দর্ভ, জার্নাল প্রবন্ধের উপর নির্ভর করা হবে। কারণ যদিও কোন ধর্মের অনুসারীদের আচরণের মাধ্যমেই অন্য ধর্মালম্বীরা এই ধর্মকে বিচার করে থাকে; কিন্তু ধর্মে মূলধারা তথা অধিকাংশ অনুসারীদের আচরণই কেবল এমন বিচারে কিছুটা সঙ্গত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অনুসারীদের ধর্মগ্রন্থই (scripture) এবং ধর্মের মূল ধারার রচনাসমগ্রই তাদের ধর্মকে প্রকৃতভাবে প্রতিনিধিত্ব করে এবং এর মাধ্যমেই ধর্মকে বিচার করা যৌক্তিক। প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হাসিলে গবেষণার বিশ্লেষণ পদ্ধতি (analytical method) অবলম্বন করা হবে। অত্র প্রবন্ধটি প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবনের মর্যাদাকে (human dignity) ফুটিয়ে তুলতে মানব জীবন সুরক্ষায় ইসলামের করণীয় ও বর্জনীয় বিধানসমূহ আলোচনা করা হবে। অতঃপর মানব হত্যা ও আত্মহত্যা পর্যালোচনার মাধ্যমে ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মঘাতী হামলার বিধান আলোচনা করা হবে। উক্ত আলোচনার পরিপূরক হিসেবে মাকাসিদুশ শরীয়ার (ইসলামী আইন দর্শন) আলোকে আত্মঘাতী হামলার একটি মূল্যায়ন করা হবে প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে। পরিশেষে আত্মঘাতী হামলা প্রতিরোধে ইসলামের আলোকে একটি বাস্তব পদক্ষেপের প্রস্তাব করা হবে।

## আত্মঘাতী হামলা ও প্রাসঙ্গিক পরিভাষা

**আত্মঘাতী হামলাঃ** A violent, politically motivated action executed couciously, actively, and with prior intent by a single individual (or individuals), who kills himself in the course of the operation together with his choosen target. The guaranteed and preplanned death of the perpetrator is a prerequisite for the operation's success.

একটি সহিংস, রাজনৈতিক প্ররোচনাপ্রসূত কাজ, যা সচেতনার সাথে সক্রিয়ভাবে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এক বা একাধিক ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হয়; যে তার অভিযানের স্বার্থে বাছাইকৃত টার্গেটের সাথে নিজেকেও হত্যা করে। অভিযানের সফলতার জন্য অপরাধ সংগঠনকারীর অঙ্গীকারকৃত ও পূর্বপরিকল্পিত মৃত্যু পূর্বশর্ত (Shay 2017, 8)।

**আত্মহত্যাঃ** আর্থিক ও অন্যান্য পার্থিব লোভে রাগান্বিত কিংবা হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় নিজের জীবনকে নিঃশেষ করে দেয়া (al-Ḍamūr 2010, 59; al-Qurṭubī 2003, 5/156)। এতে শুধু ব্যক্তি নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ডুরকেইম বলেন, জ্ঞাতসারে এমন ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক প্রত্যেক কাজ সংঘটিত করা, যা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ব্যক্তিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় (Durkheim and Simpson 1952, al-Ḍamūr 2010, 6)।

**মানবহত্যা:** এটি এমন মানবীয় কাজ, যার মাধ্যমে অপর মানুষের প্রাণ নিঃশেষ হয়ে যায় (Ghayẓān 1995, v)। এটি পৃথিবীর সকল ধর্ম ও সভ্যতায় সর্বোচ্চ দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য।

**মৃত্যুদণ্ড:** বিচারবিধি অনুযায়ী অপরাধের সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দেহ থেকে তার রূহকে নিঃশেষ করে দেয়া ('Āmir 2009, 39; Wahhāb 2008, 11)| নির্দিষ্ট কিছু অপরাধের (যেমন কিসাস, রিদ্দাহ, বিবাহিতের যিনা ইত্যাদির) শাস্তি স্বরূপ দেশের বিচার বিভাগ কর্তৃক অপরাধীর জীবন নিঃশেষের যে দণ্ড দেয়া হয়। এটি ইচ্ছাকৃত হত্যার অন্তর্ভুক্ত, যা একমাত্র রাষ্ট্রই অপরাধী ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করে থাকে (Mālī 2010, 2)।

**শাহাদাত:** ধর্মীয় ও মৌলিক অধিকার রক্ষায় কোন মুসলিম দেশের বা জনগোষ্ঠীর প্রধানের নেতৃত্বে শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধের যুদ্ধে নিহত হওয়া (Al-Fawwāz 2009, 63-64)।

## (১) ইসলামে মানব জীবনের মর্যাদা

পৃথিবীতে মানব জীবনের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশি। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই মানব জীবনের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; ওদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর ওদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি (Al-Qur´ān, 17:70)।

শুধু মানুষের জীবনই সুরক্ষিত ও সম্মানিত নয় বরং দেহের প্রতিটি অঙ্গকে সুরক্ষার মাধ্যমে ইসলাম মানুষকে সম্মানিত করেছে। হাদীসের ঘোষণা অনুযায়ী, একজন মুমিনের জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রু সম্মানিত ও সুরক্ষিত (Aḥmad 2001, 31/3001, 18966)।

মানব জাতির এই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে পৃথিবীর প্রথম মানব আদম (আঃ) এর সৃষ্টির কাহিনীতে। মহান আল্লাহ মানব জাতিকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত করেছেন যেগুলো অন্যান্য সকল সৃষ্টির উপর মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। তিনি মানব জাতিকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন (Al-Qur´ān, 38:75), তিনি তাঁর রূহ থেকে মানব দেহে ফুঁক দিয়েছেন (Al-Qur´ān, 15:28), মানব জাতিকে তার জ্ঞান থেকে জ্ঞানদান করেছেন (Al-Qur´ān, 2:31), সৃষ্টির প্রথম মানব আদমের সম্মানার্থে ফিরিশতাকুলকে সিজদার নির্দেশ দিয়েছেন (Al-Qur´ān, 2:34), গোটা মানব গোষ্ঠীকে একই পরিবার থেকে সৃষ্টি করেছেন (Al-Qur´ān, 4:1), তাদেরকে এই পৃথিবী আবাদ



করার দায়িত্ব দিয়েছেন (Al-Qur´ān, 11:61) এবং তাঁর খলীফা হিসেবে নির্বাচিত করেছেন (Al-Qur´ān, 2:30)। তাই ইসলাম একটি প্রাণ বাঁচানোর মহত্ত্বকে গোটা দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষার মর্যাদাসম করেছে (Al-Qur´ān, 5:32)।

মানব জীবনের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখতে ইসলাম অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে এবং মানব জীবন সুরক্ষাকে ইসলামী আইন দর্শনের (মাকাসিদুশ্ শারী'য়াহ) 'পাঁচ অপরিহার্য উদ্দেশ্যের' (পঞ্চ অপরিহার্যতা) অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই লক্ষ্য হাসিলে ইসলাম বহু ধরনের বিধান প্রণয়ন করেছে। এছাড়াও মানব জীবনের মৌলিক অধিকার ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল প্রকার অধিকার নিশ্চিতকরণে ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। নিম্নে মানব জীবন সুরক্ষায় ইসলামের সার্বিক নির্দেশনা আলোচনা করা হল।

### মানব জীবন সুরক্ষায় ইসলামের নির্দেশনা

মানব জীবন সুরক্ষায় ইসলামের নির্দেশনা অন্যান্য সকল আসমানী গ্রন্থ ও মানব রচিত বিধানের শীর্ষে। যে সব কারণে মানব জীবনের সুরক্ষা হতে পারে এবং যে সব কারণে মানব জীবনের মর্যাদাহানি হতে পারে-এমন সব করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

### ক. মানব জীবন সুরক্ষায় করণীয় বিধানসমূহ

মানব জীবনের সকল স্তরে সুস্থ, সবল ও কর্মঠ থাকাই মানব জীবন সুরক্ষার বহিঃপ্রকাশ। তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল স্তরে জীবন সুরক্ষার নিমিত্তে ইসলাম সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশ দিয়েছে। এ সকল নির্দেশ মেনে চললে মানুষ তার জীবনকে সঠিকভাবে রক্ষা করতে পারবে। মানব জীবন সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে নিম্নের করণীয় বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য:

### হালাল পানাহারের নির্দেশ

মানব জীবন বাঁচিয়ে রাখার প্রধান উপকরণ পানাহার। তাই জীবন রক্ষায় ইসলাম স্বাভাবিক অবস্থায় হালাল পানাহারের নির্দেশ দিয়েছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে পানাহারকে ফরয (অত্যাবশ্যক) করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا.

হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর... (Al-Qur´ān, 2:168)।

এছাড়াও কুরআনের আরো অনেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হালাল এবং পবিত্র আহার গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন (Al- Qur´ān, 2:57, 172; 5:87-88; 7:160; 8:69; 16:114; 20:81)।

## বিবাহের বিধান

পৃথিবীতে মানুষের জন্মলাভের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে বৈধ বিবাহের পারিবারিক মাধ্যম। অন্যথায় অবৈধ পন্থায় জন্মলাভকারী শিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে বেড়ে উঠে না। চারিত্রিক শিক্ষা থেকেও তারা দূরে অবস্থান করে। ফলে তাদের মাধ্যমে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়। এ সকল মানুষ সমাজে এক ধরনের বিচ্ছিন্ন ও মানহীন জীবন যাপন করে থাকে। তাই পৃথিবীতে মানুষের সম্মানকে অক্ষুন্ন রাখতে এবং মানব জীবনের ক্রমধারাকে অব্যাহত রাখতে ইসলাম বিবাহ বিধানের প্রবর্তন করেছে (Al-Qur´ān, 4:3)। পাশাপাশি ইসলাম বিবাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে যাতে পৃথিবীতে মানব জীবনের বিলুপ্তি না ঘটে। বিবাহ শুধুমাত্র মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য নয় বরং সৎ সন্তান লাভের মাধ্যমে পৃথিবীতে নতুন প্রাণের আবির্ভাব ঘটানো বিবাহ বিধানের অন্যতম লক্ষ্য। হাদীস শরীফে এসেছে:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ.

মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি এক সুন্দরী ও মর্যাদাসম্পন্ন নারীর সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিয়ে করবো? তিনি বললেন: না। অতঃপর লোকটি দ্বিতীয়বার এসেও তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁকে নিষেধ করলেন। লোকটি তৃতীয়বার তাঁর নিকট এলে তিনি তাকে বললেন: এমন নারীকে বিয়ে করো যে প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী। কেননা আমি অন্যান্য উম্মতের কাছে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করবো (Abū Dāwūd 2009, 2/542, 2050)।

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাতিবীর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, বিবাহের প্রধান এবং প্রথম উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রজনন (al-Shātibī 1997, 2/397; Iḥmīdān 2008, 133-134)।

## পারিবারিক শৃঙ্খলা বিধান

একমাত্র সুশৃঙ্খল পারিবারিক জীবনের মাধ্যমেই নতুন প্রজন্মকে সুস্থ ও সবলভাবে গড়ে তোলা সম্ভব। এজন্য ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ পারিবারিক জীবন বিধান উপহার দিয়েছে, যাতে রয়েছে বংশক্রম রক্ষার সুস্থ পদ্ধতি, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার, সন্তানের অধিকার, পিতা-মাতার অধিকার এবং পারিবারিক আচরণবিধি যার মাধ্যমে একটি সুন্দর পরিবার ও সমাজ সৃষ্টি হতে পারে। ইসলামের সোনালি যুগের পারিবারিক জীবনধারা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই পৃথিবীতে মানবজাতির ক্রমবর্ধমান ধারা অব্যাহত রাখতে এবং মানব সভ্যতার বিকাশে ইসলামের পারিবারিক জীবনবিধান অবশ্যম্ভাবী (Iḥmīdān 2008, 134-136)।



## পারিবারিক আর্থিক বিধান

পারিবারিক আর্থিক বিধানের মাধ্যমে ইসলাম মানব জীবন সুরক্ষাকে নিশ্চিত করেছে। মানব জীবন সুরক্ষার অধিকাংশ উপকরণই অর্থ ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। পরিবারের একজন সক্ষম ব্যক্তি নিজেই তার জীবিকা উপার্জন করতে পারে। পক্ষান্তরে, পরিবারের শিশু ও বৃদ্ধসহ যারা জীবিকা অর্জন করতে অক্ষম, জীবন রক্ষার নিমিত্তে ইসলাম পারিবারের সক্ষম ব্যক্তিদের উপর তাদের জীবিকার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। উলামায়ে কিরামের ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, সম্পদহীন অক্ষম সন্তানদের জীবিকার জন্য ব্যয় করা পিতা-মাতার উপর ফরয (Ibn Qudāmah 1968., 7/583; Al-Sarakhsī 1978, 5/222; Al-Shaybānī 1986, 3/ 242; Al-Nawawī 1985, 9/83; Iḥmīdān 2008, 136)। মহান আল্লাহ বলেন:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.

যদি তারা তোমাদের সন্তানদিগকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে ( Al-Qur´ān, 65:6)।

হাদীস শরীফে এসেছে:

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত যে, হিনদ্ বিনতি উতবা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমাকে এ পরিমাণ খরচ দেন না, যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট; তবে তার অজানাতে যা আমি (চাই) নিতে পারি। তখন তিনি বললেন: তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য নিয়মানুসারে যা যথেষ্ট হয় তা তুমি (তার অজানাতে) নিতে পার (al-Bukhārī, 1422H, 5/2052, 5049)।

উল্লেখ্য যে, স্বাভাবিক অবস্থায় স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার সম্পদ ব্যয় করার অধিকার স্ত্রীর নেই; কিন্তু স্ত্রীর নিজের ও তার সন্তাদের জন্য নিয়মানুসারে যথেষ্ট হয় এমন পরিমাণ সম্পদ স্বামীর অগোচরে তার থেকে ব্যয় করার অনুমতি ইসলাম স্ত্রীকে প্রদান করেছে। এই অনুমোদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জীবনকে সুরক্ষা করা। তবে এ ক্ষেত্রে নিয়মানুসারে যথেষ্ট হয় শুধু এ পরিমাণ সম্পদ ব্যয়ে স্ত্রীর সততা একান্তই জরুরী।

অনুরূপভাবে, সম্পদহীন পিতা-মাতার জন্য ব্যয় করা সন্তানের উপর ফরয; এবং এ ব্যাপারেও স্কলারদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অধিকাংশ স্কলারের মতে, দাদা-দাদী, নানা-নানী ও তদূর্ধ্বের জন্য এবং নাতি-নাতনি ও তদনিম্নের জন্য একই বিধান প্রযোজ্য (Ibn Qudāmah n.d., 7/583; Al-Sarakhsī 1978, 5/222; Al-Shaybānī 1986, 3/ 242; Al-Nawawī 1985, 9/83; Iḥmīdān 2008, 137)। ইসলামের এই যুগান্তকারী পারিবারিক বিধানের লক্ষ্যই হচ্ছে মানব জীবনকে সুরক্ষা করা।

**নিরুপায় অবস্থায় নিষিদ্ধ পানাহারের অনুমোদন**

স্বাভাবিক অবস্থায় মানব জীবন সুরক্ষার জন্য ইসলাম হালাল পানাহারের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে এবং তার জীবন রক্ষার জন্য ন্যূনতম পানাহার আবশ্যক হয়ে পড়ে, ঠিক সেই মুহূর্তে ইসলাম এমন ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ পানাহার গ্রহণের সাময়িক অনুমোদন দিয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য দলীলের পাশাপাশি উলামায়ে কিরামের ইজমা হয়েছে যে, জীবন রক্ষার জন্য বাধ্য হলে হারাম পানাহার গ্রহণ করা বৈধ (Iḥmīdān 2008, 142)। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

নিশ্চয় আল্লাহ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যার উপর আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে, তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় কিন্তু নাফরমান কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (Al-Qur´ān, 2:173)।

এছাড়াও কুরআনের অন্যান্য জায়গায় এমন অনুমোদন দেয়া হয়েছে (Al-Qur´ān, 5:3; 6:119)।

**রোগ প্রতিরোধের নির্দেশনা**

সুস্থতা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মানব জীবনের এক অপার নিয়ামত। মানুষের ইহলৌকিক দায়িত্ব-কর্তব্য এবং পরলৌকিক ইবাদত-বন্দেগী সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সুস্থতা অত্যন্ত জরুরী। পক্ষান্তরে রোগ-ব্যাধিও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের ঈমান ও নৈতিক উন্নয়নের পন্থা ও পরীক্ষা স্বরূপ। একারণে জীবন রক্ষার তাগিদে রোগ প্রতিরোধে ইসলাম ঔষধ গ্রহণ করতে নির্দেশনা দিয়েছে। শুধু তাই নয় বরং অসুস্থতা ও ঔষধ গ্রহণের পূর্বেই ইসলাম নিবৃত্তিমূলক চিকিৎসা (الطب الوقائي/ preventive medicine) ও প্রতিষেধক চিকিৎসার (الطب العلاجي/ healing medicine) উভয় প্রকার চিকিৎসার নির্দেশনা দিয়েছেন। নিবৃত্তিমূলক চিকিৎসা হিসেবে যা কিছুই রোগের কারণ হতে পারে তা থেকেই ইসলাম বারণ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ পানাহারে অপচয় সম্পর্কে রাসুল ﷺ বলেন:

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ.

মানুষ পেট হতে অধিক নিকৃষ্ট কোন পাত্র পূর্ণ করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে এমন কয়েক গ্রাস খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন হলে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে (Al-Tirmidhī 1975, 9/224, 2385)।



প্রতিষেধক চিকিৎসা হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আধ্যাত্মিক চিকিৎসা যেমন ঝাড়ফুঁক ও দোয়া এবং বস্তুগত চিকিৎসা যেমন রোগের উপযুক্ত ঔষধ গ্রহণ ইত্যাদি শিক্ষা দিয়েছেন। অপরপক্ষে, মানুষের জীবন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর সকল প্রকার সীমালঙ্ঘনকে ইসলাম হারাম করেছে; এবং এগুলোকে কবীরা গুনাহ (বড় অপরাধ) হিসেবে ঘোষণা করেছে। এমন সীমালঙ্ঘনকে বন্ধ করতে ইসলাম মৌলিক শাস্তি যেমন কিসাস (قصاص/ revenge), রক্তমূল্য (دية/ blood money); বদলামূলক শাস্তি যেমন রক্তমূল্য, প্রহার, রোযা; এবং অনুগামী শাস্তি যেমন ওসিয়ত, উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি বিধান প্রবর্তন করেছে, (Iḥmīdān 2008, 147-159)।

**আত্মরক্ষার নির্দেশ**

বেঁচে থাকার অধিকার মানুষের সর্বোচ্চ অধিকার। তাই অন্যায় ও জুলুমের উপর চুপ মেরে নির্যাতিত হওয়ার কোন সুযোগ ইসলামে নেই; বরং জান, মাল, ইজ্জত যে কোন কিছুর উপর আক্রমণ হলে আত্মরক্ষায় আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা কর্তব্য। এজন্য ইসলাম মানুষকে অন্যায় ও জুলুমের শিকার হলে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

সুতরাং যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাকীদের সাথে থাকেন (Al-Qur´ān, 2:194)।

এই আয়াতটি পরিষ্কারভাবে সমপরিমাণ পাল্টা আক্রমণকে বুঝাচ্ছে। এটি সকল প্রকার আক্রমণকে শামিল করে (Khuzaym 2010, 9)। এ প্রসঙ্গে ইমাম তাবারী বলেন, যে তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করে অর্থাৎ যে তোমাদের উপর আক্রমণ করে এবং জুলুমের মাধ্যমে চড়াও হয়, তোমরাও তার উপর সীমালঙ্ঘন করো অর্থাৎ আক্রমণ করো এবং তার উপর চড়াও হও তারা তোমাদের প্রতি যা করেছে তার বদলা স্বরূপ; জুলুম হিসেবে নয় (al-Ṭabarī 2000, 3/582)। হাদীস শরীফে এসেছে:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

সাঈদ ইবনে যাইদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি: যে লোক নিজের ধনমাল রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে

শহীদ। যে লোক নিজের দীনকে হিফাযত করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ। যে লোক নিজের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ। যে লোক তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে মারা যায় সেও শহীদ (Al-Tirmidhi, 4/30, 1421)।

উক্ত হাদীসটি প্রমাণ করছে, যে ব্যক্তি তার জান, মাল, দীন এবং পরিবার যে কোন একটিকে প্রতিহত করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ হিসেবে পরিগণিত হবে (Al-Mubayyaḍ 2005, 366)। যেহেতু উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতিহতকরণে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াকেও শাহাদাত হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে, তাই এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আত্মরক্ষার যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াও অনুমোদিত। কেউ কেউ বলেন, একজন মুমিন তার জান, মাল, দীন এবং পরিবারসহ সম্মানিত। সুতরাং যখনি এর যে কোন একটির উপর আক্রমণ হবে, তখনি প্রতিহত করা অনুমোদিত (Al-Mubārakpūrī 2010, 4/681)। অধিকন্তু পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আত্মরক্ষামূলক পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আত্মরক্ষাকে ফরয করেছেন।

### খ. মানব জীবন সুরক্ষায় বর্জনীয় বিধানসমূহ

মানব জীবন সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে করণীয় বিধানের পাশাপাশি ইসলাম কিছু বর্জনীয় বিধানও প্রণয়ন করেছে। তন্মেধ্যে অবৈধ যৌনাচার, মানব হত্যা, আত্মহত্যা, আত্মঘাতী প্রতিবাদ ও দৈহিক ক্ষতিসাধন নিষেধাজ্ঞামূলক বিধানগুলো উল্লেখযোগ্য।

### অবৈধ যৌনাচার নিষিদ্ধকরণ

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুস্থ দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে নতুন মানব প্রাণের আবির্ভাব ঘটে। এটি সৃষ্টির জন্য মহান স্রষ্টার দেয়া প্রাকৃতিক পন্থা। এই পন্থা ছাড়া অন্য সকল পন্থায় মানব জীবনকে সুস্থ ও সবল রাখা সম্ভব নয়। তাই পৃথিবীর সকল ধর্মে অবৈধ যৌন সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, মানব জীবন সুরক্ষায় ইসলাম যিনাসহ অন্যান্য সকল প্রকার অশ্লীলতাকে হারাম ঘোষণা করেছে (Al-Fawwāz 2009, 41)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

...প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের নিকটেও যাবে না... (Al-Qur´ān, 6:151)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

বল, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ.. (Al-Qur´ān, 7:33)।



এখানে প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতার মাধ্যমে সকল প্রকার অবৈধ যৌন সম্পর্ক ও আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই নিষিদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পৃথিবীর মানুষকে একটি সুস্থ ও সুন্দর জীবনের নির্দেশনা দেয়ার মাধ্যমে মানব জীবনকে সুরক্ষা করা।

### মানব হত্যা নিষিদ্ধকরণ

ইসলাম কিসাস (Al-Qur´ān, 2:178), রিদ্দাহ (Al-Qur´ān, 5:54, 16:106), যাদু (al-Qurṭubī, 2003, 2/33-34), সমকামিতা (Al-Tirmidhī 1975, 4/55, 1456), ডাকাতি (Al-Qur´ān, 5:33), বিবাহিতের যিনা (Al-Bukhārī, 1422H., 4/460, 2158) জাতীয় নির্দিষ্ট কিছু অপরাধের মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ব্যতিরেকে সর্বাবস্থায় মানব হত্যাকে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ (হারাম) করেছে এবং এটিকে সর্বোচ্চ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করেছে (Al-Bukhārī, 1422H., 8/75, 6857)। মানবেতিহাসের সর্বপ্রথম হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে আদম (আঃ) এর পুত্র কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যার মাধ্যমে। এই হত্যাযজ্ঞকে আল্লাহ তা'আলা চরমভাবে তিরস্কার করেছেন এবং একটি কাক পাখির মাধ্যমে আরেকটি কাকের মৃতদেহ গোপন করার দৃশ্যপট তৈরি করে কাবিলকে এমন হত্যাকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত হতে বাধ্য করেন (Al-Qur´ān, 5:31)। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে তার ভাইকে হত্যা করতে উত্তেজিত করল। ফলে সে তাকে হত্যা করল; তাই সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল (Al-Qur´ān, 5:30)।

মহান আল্লাহ কাবিলের এই হত্যাযজ্ঞকে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে আখ্যা দিয়ে পরবর্তী জাতি বনি ইসরাঈলের উপর মানবহত্যার অপরাধের জঘন্যতার মাত্রাকে আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন এবং মানব হত্যার এই চরম ধৃষ্টতাকে দমন করতে একজন মানুষ হত্যার অপরাধকে গোটা দুনিয়ার সকল মানুষ হত্যার অপরাধসম ঘোষণা করেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.

এ কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক কার্য করা ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। তাদের নিকট তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল, কিন্তু এর পরও তাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমালঙ্ঘনকারীই রয়ে গেল (Al-Qur´ān, 5:32)।

### দৈহিক ক্ষতিসাধন নিষিদ্ধকরণ

মানব জীবন সুরক্ষায় ইসলাম হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের দৈহিক ক্ষতিসাধনের জন্য বদলা (কিসাস) ও দৈহিক শাস্তির (তা'যির) বিধান প্রণয়ন করেছে। মানব দেহের কোন অঙ্গ কেটে ফেলা বা তার কার্যকারিতা বিনষ্ট করা, মাথায় জখম করা কিংবা অন্য কোন অঙ্গে আঘাতের মাধ্যমে কাউকে আহত করা ইত্যাদির বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে ইসলাম মানব জীবন সুরক্ষাকে নিশ্চিত করেছে এবং মানব জীবনের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে ('Āmir 2012, 146)। অঙ্গহানির বদলা সংক্রান্ত বিধান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

আমি তাদের জন্য এতে বিধান দিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে জখম। অতঃপর কেউ এটা ক্ষমা করলে এটা তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম (Al-Qur´ān, 5:45)।

মানব জীবন সুরক্ষায় ইসলামের সার্বিক নির্দেশনা নিম্নের চিত্র-১ থেকে অনুধাবন করা যাবে।

চিত্র-১: মানব জীবন সুরক্ষায় ইসলামের সার্বিক নির্দেশনা



### (২) ইসলামে আত্মঘাতী হামলা

আত্মঘাতী হামলায় আক্রমণকারী ব্যক্তি ও আক্রান্ত মানুষদের প্রাণহানি ঘটে এবং অনেকে নৃশংসভাবে আহত হয়। মানব হত্যা ও আত্মহত্যা উভয় প্রকারের হত্যাকাণ্ডই এমন আত্মঘাতী হামলায় সংঘটিত হয়। তাই মানব হত্যা ও আত্মহত্যার সমন্বিত বিধানই আত্মঘাতী হামলার ইসলামী বিধান। এ প্রেক্ষিতেই আত্মঘাতী হামলার বিধানকে পর্যালোচনার নিমিত্তে ইসলামে মানব হত্যা ও আত্মহত্যার বিধান নিম্নে আলোচনা করা হল।

### ক. ইসলামী বিধানে মানব হত্যা

জীবনের নিরাপত্তা প্রতিটি মানুষের সর্বোচ্চ মৌলিক অধিকার। তাই ইসলাম জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নিরপরাধ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধান এবং অপরাধীদের শাস্তির বিধান করেছে। মুসলিমদের পাশাপাশি নিরপরাধ অমুসলিমদেরও নিরাপত্তা বিধান করেছে ইসলাম। ইতঃপূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে মানব হত্যার নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ করা হলেও মানব হত্যা নিষিদ্ধকরণ ও দমনে ইসলামে বহুমুখী কর্মসূচি রয়েছে। মানব হত্যা দমনে ইসলামের নিম্নোক্ত বিধানগুলো উল্লেখযোগ্য।

### মানব হত্যার দণ্ডবিধি

মানব হত্যা দমনে পার্থিব দণ্ডবিধিতে ইসলাম এর সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করেছে। তবে হত্যার বিভিন্নতার কারণে শাস্তির ধরনও ভিন্ন। ইচ্ছাকৃত মুসলিম হত্যার জন্য ইসলাম কিসাসের বিধান জারী করেছে ('Āmir 2012, 114)। ইসলাম ইচ্ছাসদৃশ হত্যার জন্য কঠিন রক্তপণ (hard blood money) এবং হত্যাকারী নিহতের মিরাস হতে বঞ্চিত হবার বিধান আরোপ করেছে ('Āmir 2012, 130-133)। ভুলবশত হত্যার জন্য রক্তপণ (blood money), কাফফারা (money expiation) এবং হত্যাকারী নিহতের মিরাস ও অসীয়ত হতে বঞ্চিত হবার বিধান আরোপ করা হয়েছে ('Āmir 2012, 135-138)। অমুসলিম জিম্মী যে জিয্য়া প্রদান করে মুসলিম দেশে অবস্থান করার অনুমতি পেয়েছে তাকে কোন মুসলিম হত্যা করলেও তার জন্য রক্তমূল্যের বিধান ইসলাম আরোপ করেছে। একইভাবে মুসলিম জনপদের সাথে কোন অমুসলিম ব্যক্তি কিংবা জনগোষ্ঠী চুক্তিবদ্ধ হলে ইসলামী বিধানে তারাও মুসলিম জনপদে নিরাপদ। কোন অমুসলিম তার প্রয়োজনে অনুমতি সাপেক্ষে মুসলিম দেশে সাময়িকভাবে প্রবেশ করলে সেও নিরাপদ। যদি কোন মুসলিম এ ধরনের জিম্মী, চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম কিংবা নিরাপত্তাকামীকে হত্যা করে, তাহলে তার উপর কিসাসের বিধান আরোপিত হবে। এটি ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তাঁর অনুসারী সহযোগীবৃন্দ এবং ইবন আবু লায়লার অভিমত ('Āmir 2012, 125-128)। উল্লেখ্য যে, মুসলিম ও অমুসলিম হত্যার শাস্তির ভিন্নতা থাকলেও ইসলাম উভয় হত্যাকেই সমভাবে নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে উভয়ের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করেছে।

**মানব হত্যার নিন্দা**

ইসলামের দৃষ্টিতে কুফরি হচ্ছে সবচেয়ে বড় অপরাধ এবং এর পারলৌকিক শাস্তিও সর্বোচ্চ শাস্তি। মুসলিম হত্যার অপরাধ এতই জঘন্য যে, ইসলাম এটিকে কুফরি হিসেবে ঘোষণা করেছে। হাদীস শরীফে এসেছে:

عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.

আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: মুসলিমকে গালি দেয়া ফিসক এবং তাকে হত্যা করা কুফরি (Al-Bukhārī, 1422H, 5/2247, 5697)।

পাশাপাশি মানব হত্যাকে ইসলাম সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করেছে। হাদীস শরীফে এসেছে:

عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ، قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور، - أو قال: وشهادة الزور.

আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরক করা, মানব হত্যা করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া (Al-Bukhārī, 1422H, 9/3, 6872)।

মানব হত্যাকারীকে ইসলাম মুসলিম জনগোষ্ঠীর গণ্ডি বহির্ভূত হিসেবে বিবেচনা করে। হাদিস শরীফে এসেছে:

عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ قال من حمل علينا السلاح فليس منا.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয় (al-Bukhārī, 1422 H, 6/2520, 6480)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন:

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال... ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه.

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: কেউ যদি আমার উম্মতের উপর এমন যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় যে, সে যাচাই বাছাই ছাড়াই ভালো মন্দ সকল লোককেই হত্যা করে এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণের পরিণতি সম্পর্কে মোটেও ভয় করেনা এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েও রক্ষা করে না, এমতাবস্থায় আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই, আমারও তার সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না (Muslim 1991, 6/20, 4892)।

ইসলাম মানব জীবনকে এমন উচ্চাসনে উন্নীত করেছে যে, একজন মুসলিমের হত্যা আল্লাহর কাছে গোটা পৃথিবী ধ্বংসের চেয়েও গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। হাদীস শরীফে এসেছে:



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: একজন মুমিনের হত্যার চাইতে দুনিয়া নিঃশেষ হয়ে যাওয়া আল্লাহর কাছে অধিকতর সহজ (Al-Tirmidhī 1975, 4/16, 1395)।

মানব হত্যার এমন জঘন্যতার কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রদত্ত শেষ ভাষণে এর নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করেন। হাদীস শরীফে এসেছে:

عن أبي بكرة قال خطبنا النبي ﷺ يوم النحر قال ... فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم...

আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কুরবানির দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে খুৎবা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন... নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত ও সম্পদ আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই ভূখণ্ডের মত হারাম (পবিত্র ও সুরক্ষিত) ঐ দিন পর্যন্ত যে দিন তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে (Al-Bukhārī 1422, 6/228, 1625)।

মানব হত্যায় শুধুমাত্র হত্যাকারীর সরাসরি ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয় না; বরং কেউ কেউ তার উপরস্থ ব্যক্তিবর্গের উৎসাহ কিংবা নির্দেশে এমন হত্যাকাণ্ড ঘটাতে বাধ্য হয়। বাধ্য-বাধকতায় কখনও হত্যাকারীর নিজস্ব ইচ্ছাও জাগ্রত হয়, আবার কখনও অনন্যোপায় হয়েও হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে। মানব হত্যা দমনে ইসলাম নির্দেশকারী ও উৎসাহদাতাসহ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সকলকে দণ্ডবিধির আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করেছে ('Abīd 2015, 75)। হত্যাকাণ্ডে বাধ্য করাকে ইসলামী আইনে হত্যাকাণ্ডে উৎসাহ দান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে ('Awdah 2010, 368)। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেঈর মতে বাধ্যকারীর উপর কিসাসের বিধান কার্যকর হবে (Al-Kāsānī 1986, 7/179)।

মানব হত্যা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ অপরাধ বিধায় পরকালে এর বিচার সর্বপ্রথম করা হবে। হাদীস শরীফে এসেছে:

عن عبد الله قال : قال النبي ﷺ أول ما يقضى بين الناس في الدماء.

আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: (বিচার দিবসে) মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম রক্তপাতের বিচার করা হবে (Al-Bukhārī, 1422H, 6/2517, 6471)।

পরিণতিতে মানব হত্যাকারী সৃষ্টিকর্তার অসন্তুষ্টি ও লানত প্রাপ্ত হবে এবং জাহান্নামে চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লানত করবেন এবং তার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত রাখবেন (Al-Qur´ān, 4:93)।

### খ. ইসলামী বিধানে আত্মহত্যা

আত্মহত্যা মানুষের নিজের বিরুদ্ধে একটি আত্মঘাতীমূলক অপরাধ, যা পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম ও সভ্যতা নিষিদ্ধ করেছে। তবে আত্মহত্যা নিষিদ্ধকরণ ও দমনে ইসলামের বিধান সামগ্রিক ও অতুলনীয়। ইসলামে মানুষের জান ও মালের প্রকৃত অধিকারী মানুষ নয়; বরং এগুলোকে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মানুষের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমানত হিসেবে রাখা হয়েছে। আত্মহত্যা কিংবা মালে অপচয় করার মাধ্যমে মানুষ আমানতের খেয়ানত করে আল্লাহর হক বিনষ্টকারী হিসেবে গণ্য হয়। এজন্য স্বীয় আত্মা বিনষ্ট করার অধিকার মানুষের নেই। পাশাপাশি ইসলামে বেঁচে থাকার অধিকারকে মানুষের সর্বোচ্চ মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাই জীবন বিনষ্ট করে, জীবনের ক্ষতিসাধন করে এবং জীবন নাশের প্রতি উৎসাহিত করে এমন সকল কাজকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। এমনকি মৃত্যু কামনা করাকেও ইসলাম নিষেধ করেছে। হাদীস শরীফে এসেছে:

عن أنس بن مالك: قال النبي ﷺ لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.

আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ দুঃখ কষ্টে পতিত হবার কারণে যেন মৃত্যু কামনা না করে। অনন্যোপায়ে যদি কিছু করতেই হয়, তাহলে সে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখ, যতদিন আমার জন্য বেঁচে থাকা কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দাও, যখন আমার জন্য মরে যাওয়া কল্যাণকর হয় (Al-Bukhārī 1422H, 5/2146, 5347)।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তোমরা তাকে হত্যা করবে না। তোমাদেরকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা অনুধাবন কর (Al-Qur´ān, 6:151)।

পবিত্র কুরআনে এই আয়াতসহ অন্যান্য যে সকল আয়াতে মানব হত্যার নিষেধাজ্ঞা এসেছে সেখানে আত্মহত্যাও অন্তর্ভুক্ত। আত্মহত্যার অপরাধ দ্বিগুণ (double crime) এবং অন্য মানুষকে হত্যা থেকেও এটি জঘন্যতম অপরাধ; কারণ আত্মহত্যাকারী



স্বীয় আত্মহননের মাধ্যমে মানব হত্যার অপরাধী এবং পাশাপাশি নিরপরাধ স্বীয় আত্মাকে হত্যাকারী হিসেবে বিবেচিত। এজন্য ইসলাম আত্মহত্যার অপরাধকে অন্য যে কোন মানবহত্যা অপেক্ষা অধিক জঘন্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করেছে ('Abīd 2015, 29; Al-Qurṭubī 2003, 5/157)। পবিত্র কুরআনে আরো এসেছে:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎ কাজ কর, আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোককে ভালবাসেন (Al-Qur´ān, 2:195)।

উক্ত আয়াতে ধ্বংস দ্বারা আত্মহত্যা এবং যে কোন পন্থায় স্বীয় প্রাণ ধ্বংস করাকে বুঝানো হয়েছে। এতে নেশা জাতীয় জিনিষ গ্রহণ, বিষপান, নিজেকে গুলি করা ও জ্বালিয়ে দেয়া ইত্যাদি যে সকল পন্থায় প্রাণ নিঃশেষ হয় সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক যুগের স্কলারগণ ধূমপান ও বেপরোয়া গাড়ী চালানোকেও আত্মহত্যার পন্থা হিসেবে গণ্য করেন ('Abīd 2015, 60)। হাদীস শরীফে এসেছে:

ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم.

আর যে নিজেকে কোন কিছুর মাধ্যমে হত্যা করল, সে জাহান্নামের আগুনে তা দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে (Al-Bukhārī 1422 H, 20/337, 6161)।

আত্মহত্যার নিন্দা স্বরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আত্মহত্যাকারীর জানাযায় অংশ নেননি। হাদীস শরীফে এসেছে:

عن جابر بن سمرة أن النبي ﷺ أخبر: أن رجلا قتل نفسه قال إذا لا أصلي عليه.

জাবির ইবনে সামুরা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সংবাদ দেয়া হয় যে, একলোক আত্মহত্যা করেছে। তিনি বলেন: তাহলে আমি তার উপর জানাযা পড়ব না (Aḥmad 1995, 5/91, 20880)।

### আত্মহত্যা প্রতিরোধে ইসলামের বিধান

আত্মহত্যায় সহযোগী সকল বিষয়ের নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে আত্মহত্যা প্রতিরোধে ইসলাম একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া উপস্থাপন করেছে। যে সব পন্থায় আত্মহত্যা সংঘটিত হয় সেগুলো দু'ধরনের: নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হওয়া এবং করণীয় কাজ বর্জন করা। আত্মহত্যা প্রতিরোধে উভয় পন্থার ব্যাপারেই ইসলামের সুস্পষ্ট আদেশ-নিষেধ রয়েছে (Al-Mubayyaḍ 2005, 375-380)। নিম্নোল্লেখিত বিধানগুলো এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে।

### ফরয ইবাদতে রুখসাতের বিধান

ইসলামী জীবন দর্শনে পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইবাদত (আনুগত্য ও দাসত্ব) করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য (Al-Qur´ān, 51:56)।

এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর কিছু মৌলিক ও ঐচ্ছিক ইবাদতের বিধান আরোপ করেছেন। ঐচ্ছিক ইবাদতের বিধান মূলত মৌলিক ইবাদতের পরিপূরক হিসেবে করা হয়েছে। মৌলিক ইবাদত পালন করা আবশ্যক। তাই মৌলিক ইবাদতে ইচ্ছাকৃত যে কোন ধরনের শৈথিল্য প্রদানের অনুমতি ইসলামে নেই। কিন্তু মৌলিক ইবাদত বাস্তবায়নের প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়া মানুষের জীবনকে যদি হুমকির সম্মুখীন করে, তাহলে মৌলিক ইবাদত বাস্তবায়নে রুখসাতের অনুমোদন ইসলাম দিয়েছে। এর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ফরয ওযু-গোসলের ক্ষেত্রে ছাড় এবং এগুলোর বিকল্প হিসেবে তায়াম্মুমের (পবিত্রতার নিয়ত সহকারে মাটি, বালু ইত্যাদি দিয়ে হাত ও মুখমণ্ডল মাসেহ করা) বিধান। অসুস্থ ব্যক্তি ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ওযু-গোসল করলে যদি তার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে তার জন্য তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জনের বিধান ইসলাম প্রণয়ন করেছে। শুধু তাই নয়; বরং কোন সুস্থ মানুষও যদি প্রচণ্ড শীতের কারণে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল করলে তার জীবন নাশের আশঙ্কা করে তার ক্ষেত্রেও ইসলাম তায়াম্মুমের বিধান রেখেছে এবং এর মাধ্যমে আবশ্যকীয় গোসলে ছাড় প্রদান করেছে। হাদীস শরীফে এসেছে:

عن عمرو بن العاص، أنه قال لما بعثه النبي ﷺ عام ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمتُ على رسول الله ﷺ ذكرت ذلك له، فقال: "يا عمرو صَلَّيت بأصحابك وأنت جُنُبٌ!" قال: قلت يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلكَ، فذكرت قول الله [عز وجل] (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا.

আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাতুস সালাসিল যুদ্ধের সময় খুব শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমার ভয় হলো যদি গোসল করি তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হবো। তাই আমি তায়াম্মুম করে লোকদের সাথে সালাত আদায় করলাম। পরে তারা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জানালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আমর! তুমি নাকি জুনুবী (গোসল ফরয হয়েছে এমন) অবস্থায় তোমার সাথীদের সঙ্গে সালাত আদায় করেছ! তখন আমি গোসল না করার কারণ সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম এবং বললাম, আমি আল্লাহর এই বাণী শুনেছি: "তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান" (সুরা আন-নিসা: ২৯)। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন এবং কিছুই বললেন না (Abū Dāwūd 2009, 1/92, 334)।



উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, যদি কেউ আশঙ্কা করে যে, প্রচণ্ড শীতে ওযু বা গোসল করলে সে মারা যেতে পারে, তাহলে সে তায়াম্মুম করে তার মৌলিক ইবাদত সম্পন্ন করবে। কিন্তু এমন আশংকা সত্ত্বেও কেউ যদি ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ওযু বা গোসল করে, অতঃপর এই ঠাণ্ডা জনিত কারণেই মারা যায়, তাহলে সে আত্মহত্যাকারী হিসেবে গণ্য হবে। কারণ ইসলাম তার জন্য বিকল্প পন্থা রাখার পরও সে এটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করে জীবন নাশের পথকে বেছে নিয়েছে। আত্মহত্যা প্রতিরোধে ইসলামের ইবাদত সংক্রান্ত এমন অগণিত বিধান রয়েছে, যা মানব জীবন সুরক্ষায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে।

### পানাহারের বিধান

পানাহারের মাধ্যমেই মানুষ জীবন ধারণ করে এবং দীর্ঘ সময় ধরে পানাহার করতে না পারলে মানুষ ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগুতে থাকে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার বর্জন করে যদি কেউ মারা যায়, তাহলে সেটি আত্মহত্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ বেঁচে থাকার উপকরণ পানাহারকে ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেই মৃত্যুকে বেছে নিয়েছে। ইসলাম এ ধরনের আত্মহত্যা এবং এর সহায়ক সকল আচরণ ও কাজকে নিষিদ্ধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না (Al-Qur´ān, 2:195)।

এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম জাসসাস বলেন, যে ব্যক্তি হালাল পানাহার চিরতরে বর্জন করে এবং ক্ষুধায় মারা যায় আলিমগণের মতে সে আত্মহত্যাকারী হিসেবে গণ্য হবে। অধিকন্তু, যে ব্যক্তি ক্ষুধা নিবারণের জন্য নাপাক কিংবা হারাম পানাহার ছাড়া অন্য কিছু না পায়, তাহলে এমন পানাহার গ্রহণ করে মৃত্যু থেকে নিজেকে রক্ষা করাও তার উপর ফরয (Al-Jaṣṣāṣ 1992, 157)। কিন্তু যদি সে তা গ্রহণ না করে ক্ষুধায় মারা যায়, এমতাবস্থায়ও সে আত্মহত্যাকারী হিসেবে গণ্য হবে; কেননা পানাহার গ্রহণ না করার মাধ্যমে সে নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে (Al-Ḥaṭṭāb 1992, 233)।

### ঔষধ গ্রহণের বিধান

মানবদেহের সুস্থতা ও অসুস্থতা দুটিই সৃষ্টিকর্তার নিয়ন্ত্রিত বিষয় হলেও এগুলোকে তিনি পার্থিব কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন। তাই অসুস্থ হলে সুস্থতার জন্য ঔষধ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোন অসুস্থ ব্যক্তি যদি ঔষধ গ্রহণ না করে এবং মারা যায়, তাহলে সে আত্মহত্যাকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ধরনের আত্মহত্যাকেও ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ ধরনের আত্মহত্যা প্রতিরোধে ইসলাম ঔষধ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই

ঔষধ গ্রহণ করতেন এবং সাহাবীদেরকে ঔষধ গ্রহণের পরামর্শ দিতেন। হাদীস শরীফে এসেছে:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَتِ الأَعْرَابُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: " نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ قَالَ: دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «الهَرَمُ.«

উসামা ইবন শারীক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বেদুঈন আরবরা একবার বলল, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা কি (রোগীর) চিকিৎসা করব না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর বান্দাহগণ! তোমরা চিকিৎসা কর। আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার ঔষধ বা নিরাময়ের ব্যবস্থা রাখেননি (রোগও দিয়েছেন, রোগ সারাবার ব্যবস্থাও করেছেন)। কিন্তু একটি রোগের কোন নিরাময় নেই। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসুল! সে রোগটি কী? তিনি বললেন: বার্ধক্য (Al-Tirmidhī 1975, 4/191, 2043)।

### জীবন রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টার বিধান

ইসলাম যেহেতু জীবন রক্ষাকে ফরয করেছে, সেহেতু জীবন রক্ষার উপায় থাকা সত্ত্বেও চেষ্টা না করে যদি কেউ মারা যায়, তাহলে সে আত্মহত্যাকারী হিসেবে গণ্য হবে। উদাহরণ স্বরূপ যদি এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে এমন পানির মধ্যে নিক্ষেপ করে, যেখান থেকে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি ইচ্ছে করলে উঠে আসতে সক্ষম, কিন্তু সে চেষ্টা না করে মারা গেল, তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে নিক্ষিপ্ত ও হত্যাকৃত হিসেবে বিবেচিত হবে না; বরং সে আত্মহত্যাকারী হিসেবে গণ্য হবে। কারণ স্বাভাবিকভাবে পানি থেকে উঠে এসে মৃত্যু থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব তার পক্ষে ছিল; অথচ সে তা করল না। তবে এক্ষেত্রে অধিকাংশ (জমহুর) উলামার মতে নিক্ষেপকারীর উপর কোন রকম রক্তমূল্য (blood money) কিংবা কিসাস আরোপিত হবে না। হানাফীদের মতে এ ধরনের ঘটনায় একটি ক্ষেত্র ব্যতিক্রম; সেটি হচ্ছে যদি কাউকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় (Ibn Qudāmah 1968, 326; 'Abīd 2015, 28)।

### আত্মহত্যায় সহযোগী কাজের বিধান

ইসলাম কোন বিষয়কে আবশ্যক করলে তার সহযোগী সকল বিষয় আবশ্যক হিসেবে গণ্য হয়। অনুরূপভাবে কোন বিষয়কে নিষিদ্ধ করলে তার সহযোগী বিষয়ও নিষিদ্ধ হিসেবে পরিগণিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে যে সব পন্থায় আত্মহত্যা সংঘটিত হত সে সব পন্থাকে যারা অবলম্বন করে, তাদের জন্য জাহান্নামেও অনুরূপ শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন এবং আত্মহত্যা থেকে সতর্ক করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ গলায় ফাঁশ দিয়ে, উঁচু পর্বত কিংবা দালান থেকে ঝাঁপ দিয়ে, পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে, বিষ ও ঔষধ সেবন করে এবং নিজেকে ছুরিকাঘাত করে আত্মহত্যা



করাকে জাহান্নামের শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। বর্তমান যুগসহ ভবিষ্যতেও আত্মহত্যার যে সব নতুন পন্থা উদ্ভাবিত হবে সবই এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে এসেছে:

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে লোক পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে, চিরকাল সে জাহান্নামের ভিতর ঐভাবে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। যে লোক বিষপানে আত্মহত্যা করবে, সে বিষ জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে। যে লোক লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনের ভিতর সে লোহা তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে তা দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে (Al-Bukhārī 1422 H., 7/139, 5778)।

বিভিন্ন পন্থায় আত্মহত্যার পরকালীন শাস্তির ঘোষণার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই এসব পন্থায় অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীস শরীফে এসেছে:

عن أبي اليَسر، أن رسولَ الله ﷺ كان يَدعُو "اللهُم إني أعوذُ بكَ مِن الهَدْمِ، وأعوذُ بكَ مِن التردِّي، وأعوذُ بكَ مِن الغَرَقِ، والحَرَقِ، والهَرَمِ، وأعوذُ بكَ أنْ يَتَخبَّطني الشيطانُ عندَ المَوت، وأعوذُ بكَ أن أموت في سبيلك مُدْبِراً، وأعوذُ بكَ أن أموتَ لَدِيغاً"

আবুল ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করতেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ হতে আশ্রয় চাই, আশ্রয় চাই গহ্বরে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ হতে, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই পানিতে ডুবে ও আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ থেকে এবং অতি বার্ধক্য হতে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই মৃত্যুকালে শয়তানের প্রভাব হতে, আমি আশ্রয় চাই আপনার পথে জিহাদ থেকে পলায়নপর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা হতে এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে মৃত্যুবরণ হতে (Abū Dāwūd 2009, 2/649, 1552)।

### যুদ্ধের ময়দানেও আত্মহত্যা নিষিদ্ধ

ইতঃপূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, ইসলাম মানব জীবন সুরক্ষায় আত্মহত্যা ও আত্মঘাতের সকল পন্থাকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। স্বাভাবিক অবস্থা ছাড়িয়ে যুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধের ময়দানে যে মুহূর্তে বিজয়ের নেশায় লড়াই করতে করতে

মুজাহিদদের শুধু শাহাদাতই কাম্য, ঠিক মুহূর্তেও শাহাদাতের পরিবর্তে আত্মঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এখানেও আত্মঘাত থেকে বাঁচার জন্য ইসলাম সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছে। শাহাদাত যাতে আত্মঘাতী কাজে পরিণত না হয়, সেজন্য যুদ্ধরত সময়েও ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট নীতিমালা। শত্রু মোকাবেলার জন্য যুদ্ধের যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া, বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধের রসদ সংগ্রহে রাখা, যুদ্ধের বাহন ব্যবহার করা, আত্মরক্ষা ও আক্রমণের জন্য কৌশল ও ফন্দি অবলম্বন করা, রমযানে যুদ্ধ হলে দুর্বলতা কাটাতে রোজা ভঙ্গ করা, শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে চার রাকাত বিশিষ্ট সালাত দুই রাকাতে সংক্ষিপ্ত করা, সকল যোদ্ধার প্রাণ রক্ষার্থে তাদের মধ্যে পানাহার ও যুদ্ধাস্ত্র বণ্টনে সমতা রক্ষা করা, যোদ্ধাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া ইত্যাদি জিহাদের অন্যতম বিধান। এসব বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে যুদ্ধের সময়ে রণক্ষেত্রের মৃত্যুও আত্মঘাতী জীবনপাতে পরিণত না হয়। যুদ্ধের ময়দানের এসব বিধান মেনে চলে কেউ নিহত হলে সেই শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। অন্যথায় জিহাদের ময়দানেও আত্মঘাতী মৃত্যু ঘটতে পারে (Al-Dāyah 2016, 29-47)।

নিচের চিত্র-২ এর মাধ্যমে ইসলামে আত্মহত্যা প্রতিরোধের প্রক্রিয়া অনুধাবন করা যাবে।

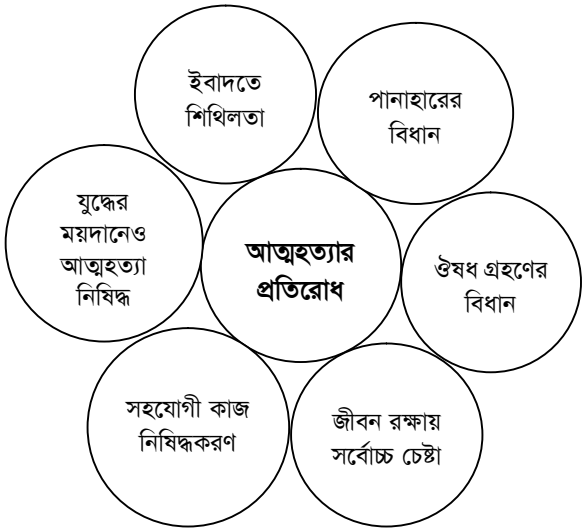


চিত্র-২ ইসলামে আত্মহত্যা প্রতিরোধের প্রক্রিয়া



**গ. ইসলামী বিধানে আত্মঘাতী হামলা**

পূর্বেকার আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামে অন্য মানুষকে হত্যা এবং আত্মহত্যা উভয় প্রকার হত্যাই হারাম। এ দুই প্রকার হত্যাকাণ্ডই আত্মঘাতী হামলায় অন্তর্ভুক্ত হয় বিধায় এ ধরনের প্রতিবাদও ইসলামে হারাম। কুরআন ও সুন্নাহ্য় নিষিদ্ধ মানব হত্যা ও আত্মহত্যার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে আত্মঘাতী হামলাও অন্তর্ভুক্ত। আত্মঘাতী হামলার অপরাধ বহুগুণ (multiple crime)। তাই মানব হত্যা এবং আত্মহত্যার চেয়েও এটি অধিকতর জঘন্য অপরাধ। আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে ব্যক্তি স্বীয় আত্মাসহ একাধিক মানুষকে হত্যা করে। অধিকন্তু সকল প্রকার আত্মঘাতী হামলাসহ সকল প্রকার হত্যায় বান্দার হকের পাশাপাশি আল্লাহর হকও লংঘিত হয়। কারণ মানুষের জান ও মাল আল্লাহ তা'আলা পরকালের জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন এবং পুনরায় আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে আমানত রেখেছেন। ফলে অন্য মানুষকে হত্যা, আত্মহত্যা এবং আত্মঘাতী প্রতিবাদের মাধ্যমে হত্যাকারী আল্লাহর দেয়া আমানতের খেয়ানত করে এবং তাঁর হক নষ্ট করে। এ জন্য ইসলাম আত্মঘাতী হামলাকে সর্বাধিক জঘন্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে এর সর্বাধিক শাস্তির বিধান রেখেছে। মানব হত্যা সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতের ব্যাখায় ইমাম ইবনুল জাওযী বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ এর ব্যাখ্যায় পাঁচটি মত রয়েছে:

**এক**. এটি বাহ্যিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর নিজের আত্মাকে হত্যা করা হারাম করেছেন।

**দুই**. তোমরা একে অপরকে হত্যা করোনা। এটি ইবনে আব্বাস, হাসান, সাঈদ ইবনে যুবাইর, ইকরামাহ, কাতাদাহ, সুদ্দী, মুকাতিল ও ইবনে কুতাইবার অভিমত।

**তিন**. তোমরা নিজেদেরকে এমন কাজ করতে বাধ্য করো না, যা প্রাণ নাশের দিকে ঠেলে দেয় যদিও সেটি ফরয কাজ হয়। এই অর্থেই পূর্বোল্লেখিত যাতুস সালাসিল যুদ্ধে 'আমর ইবনুল 'আস রা. আয়াতটির ব্যাখ্যা করে আত্মহত্যাই উদ্দেশ্য করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ঘটনার প্রেক্ষিতে হাসির মাধ্যমে এই ব্যাখ্যার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

**চার**. তোমরা তোমাদের আত্মার অধিকার থেকে গাফেল হবে না। যে তার স্বীয় আত্মার অধিকার থেকে গাফেল হয়, সে যেন তার আত্মাকে হত্যা করে। এটি ফুদাইল ইবনে আয়াদের মত।

**পাঁচ**. তোমরা তোমাদের আত্মাকে অপরাধে জড়ানোর মাধ্যমে হত্যা করো না (Ibnul Jawzī 1404H, 4/83)।

মূলত এই আয়াতের মাধ্যমে অন্য মানুষকে হত্যা, আত্মহত্যা এবং আত্মঘাতী হামলাসহ সকল প্রকার মানব হত্যাকে হারাম করা হয়েছে। তাই ইবনুল জাওযী এখানে বিশিষ্ট মুফাসসিরদের মতামত উল্লেখ করেছেন।

**শাহাদাত ও আত্মঘাতী হামলার পার্থক্য**

ইসলামী জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে কিংবা ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর উদ্দেশ্যে কেউ কেউ মানবতার কল্যাণে অনুমোদিত জিহাদের ময়দানের শাহাদাত বরণকে মানবতার বিরুদ্ধে প্ররোচিত আত্মঘাতী হামলা বা হামলাকে এক করে গুলিয়ে ফেলেন। ফলে ইসলামের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং ইসলামের মানবতা ও কল্যাণমুখী জীবন বিধানে অমানবিকতার কালিমা মাখা হয় এবং মুসলিমদের বৈরী শক্তিগুলোকে উসকিয়ে দেয়া হয়। এজন্য ইসলামের মানবতামুখী জীবনোৎসর্গ- শাহাদাত এবং অনৈসলামিক মানবতাবিরোধী আত্মঘাতী হামলার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা জরুরী।

**এক.** উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসহ সকল দিক থেকেই শাহাদাত ও আত্মঘাতী হামলার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। শাহাদাত হচ্ছে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় আমৃত্যু চেষ্টা করা এবং প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করা। শিরক ও কুফরের অবসান ঘটিয়ে পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধানকে (দীন) প্রতিষ্ঠা করাই শাহাদাতের একমাত্র উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ.

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা (কুফর-শিরক) শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর দ্বীন সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর জন্যেই হয়ে যায় (Al-Qurān, 8:39)।

শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষী যোদ্ধা (মুজাহিদ) মুসলিম উম্মাহ বা উম্মাহর কোন অংশের ধর্মীয় আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখতে এবং জাতীয় কল্যাণে নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়। বদর, ওহুদ ও খন্দকসহ ইসলামের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া জিহাদে সাহাবা, তাবেঈ ও পরবর্তী একনিষ্ঠ মুজাহিদদের শাহাদাতের ঘটনা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত (Al-Nashshār 1983)। অপরপক্ষে আত্মঘাতীরা নিজেদের ব্যক্তিগত কিংবা মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর স্বার্থে অদৃশ্য ইন্ধনে নিজের জীবনপাত করে।

**দুই.** অভিযানমূলক জিহাদে শাহাদাতের বৈধতার জন্যে ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট শর্ত। শাহাদাত অর্জনের জন্য শর্ত হচ্ছে, এটি কেন্দ্রীয় আমীর বা সমকালীন রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতিতে পরিচালিত জিহাদের ময়দানে সংঘটিত হতে হবে। মুসলমানদের ইমামই কেবল জিহাদ পরিচালনা করবেন। ইমামের অনুমতি ব্যতীত জিহাদে অংশ গ্রহণ বৈধ নয় (Ibn Qudāmah 1968, 10/368; Ibn Taymiyyah 2005, 28/ 390-391; al-Uthaymīn 1428H, 8/22)। ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি মুসলিমদের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান (Ibn Ḥajr 1379H, 6/116)। তবে আত্মরক্ষামূলক জিহাদে অংশগ্রহণের কোন শর্ত নেই।



যদি কোন মুসলিম দেশ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রতিরোধমূলক জিহাদে লিপ্ত হওয়া সবার উপর ফরয। এমন যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মুসলিমদের ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতিরও প্রয়োজন নেই। এই যুদ্ধে কেউ নিহত হলে সে শাহাদাতের মর্যাদা অর্জন করবে (Al-Tirmidhī 1975, 4/30, 1421)। পক্ষান্তরে রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য বহির্ভূত হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যেই আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়।

রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বে পরিচালিত জিহাদে শত্রুপক্ষের মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম, সৈনিকসহ সার্বিক প্রস্তুতি থাকতে হবে (Al-Qur´ān, 8:60)। ইমামের নেতৃত্বে বা অনুমতিতে সামরিক অভিযান ছাড়া বিক্ষিপ্ত অন্য কোন আক্রমণের অনুমতি ইসলামে নেই। হাদীস শরীফে এসেছে:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِى الأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ.»

মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যুদ্ধ দু'প্রকার। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করে, ইমামের আনুগত্য করে, উত্তম জিনিস খরচ করে, সহকর্মীদের সাথে কোমল ব্যবহার করে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ থেকে বিরত থাকে, তার নিদ্রা ও জাগরণ সবকিছুই সওয়াবে পরিণত হয়। আর যে ব্যক্তি অহংকার, লোক দেখানো ও সুনামের জন্য যুদ্ধ করে, ইমামের অবাধ্য হয় এবং দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, সে জিহাদের সামান্য সওয়াব নিয়েও বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে না (Abū Dāwūd 2009, 2/321, 2517)।

সুতরাং ইমামের অনুমতি বিহীন কেউ এমন জিহাদে অংশগ্রহণ করে নিহত হলে সেটি শাহাদাত হিসেবে গণ্য হবে না।

ইসলামে জিহাদের কর্তৃত্ব রাষ্ট্র বা সরকারের হাতে ন্যস্ত করার উদ্দেশ্য হলো- রাষ্ট্র বা সরকারের কর্তৃত্ব ছাড়া যদি সাধারণ লোকদেরকে জিহাদের অধিকার দেয়া হয়, তাহলে সমাজের ঐক্য ও মৈত্রীর বন্ধন ভেঙ্গে যাবে এবং রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভংগুর হয়ে যাবে, ফলে রাষ্ট্র যে কোন বহি:আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে এবং জাতীয়ভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে না (Aḥmad 1995, 2/258)। পক্ষান্তরে আত্মঘাতী আক্রমণের সাথে মুসলিমদের ইমামের অনুমতির কোন সম্পর্কই নেই; বরং এটি বিক্ষিপ্ত কিছু দলের বা ব্যক্তি বিশেষের ইন্ধনে সংঘটিত হয়ে থাকে। সাহাবীগণ জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে অনুমতি চেয়েছেন। কেউ অনুমতি পেয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন, আবার

কেউ অনুমতি না পেয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করেননি। উদাহরণ স্বরূপ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করে অনুমতি না পেয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করেননি (Al-Bukhārī 1422H, 4/32, 2875)। অনুরূপভাবে ইবনে উমর চৌদ্দ বছর বয়সে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি চেয়েছেন। অনুমতি না পেয়ে তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন (Al-Bukhārī, 1422H, 3/177, 2664)।

সুতরাং সমকালীন শাসক কিংবা রাষ্ট্র প্রধানের সম্মতি ছাড়া জিহাদের নামে যে কোন সামরিক উদ্যোগ ইসলামে ফিতনা ও বিশৃংখলা হিসেবে বিবেচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের নামে বিক্ষিপ্ত আক্রমণের ব্যাপারটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, সরকার ভালো হোক বা মন্দ, শাসকগণ ন্যায়পরায়ণ হোক বা অত্যাচারী, শাসকগণ ইসলামের নিষ্ঠাবান অনুসারী হোক বা না হোক জিহাদ সরকারের সম্মতিতেই হতে হবে। অন্যথায় এমন আক্রমণ জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে না। এটি হাসান বসরী, ইমাম আহমাদ, তার পুত্র আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, তাহাভী, ইবনে তাইমিয়া, কুরতুবী, ইবনে কুদামাহ, বাহুতী প্রমুখের অভিমত (Al-DimashqH 1418f, 555; Al-Qurṭubī 2003, 5/177; ʿAbdullāh1981, 2/258; Ibn Qudāmah 1968, 13/16; Al-Bahūtī 1402H, 3/72)।

হাদীস শরীফে এসেছে:

عن عوف بن مالك عن رسول الله ﷺ قال « خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ». قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال « لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة.«

আওফ ইবনে মালিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে। তারা তোমাদের জন্য দোয়া করে, তোমরাও তাদের জন্য দোয়া কর। পক্ষান্তরে তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারাই, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর আর তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও, তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। বলা হল, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কি তাদেরকে তরবারি দ্বারা প্রতিহত করবো না? তখন তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম রাখবে। আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোনরূপ অপছন্দনীয় কাজ দেখবে; তখন তোমরা তাদের সে কাজকে ঘৃণা করবে; কিন্তু (তাদের) আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না (Muslim 1991, 6/24, 4910)।



**তিন.** শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্রে জাতীয় ঐক্য তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ যে যুদ্ধে প্রকৃত শাহাদাত অর্জিত হবে, সে যুদ্ধে রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্ব বা অনুমোদন এবং জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য। রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি না থাকলে যুদ্ধের ময়দানের মৃত্যুও শাহাদাত হিসেবে গণ্য হবে না (Al-ʿUthaymīn 1428H, 8/22; Ibn Qudāmah 1968, 10/368; Ibn Taymiyyah 2005, 28/390-391)। অধিকন্তু রাষ্ট্রে জাতীয় ঐক্য তৈরি না হলে বিভক্ত ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে জিহাদের প্রস্তুতিও সম্পন্ন হবে না, যা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক জিহাদের ডাক দেয়ার পূর্ব শর্ত (Al-Qur´ān, 8:60)। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রের জনগণের বিভক্তি ও বিশৃঙ্খলাই আত্মঘাতী হামলাকে প্ররোচিত করে।

**চার.** শাহাদাতের মাধ্যমে যুগে যুগে ইসলাম ও মানবতার মর্যাদা বুলন্দ হয়েছে। এটি মানবতাকে মুক্তি ও নিরাপত্তার আচ্ছাদন দেয়। শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন মুসলিমদের আত্মিক মনোবল বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে, আত্মঘাতী হামলা যুগ যুগ ধরেই মানুষের মাঝে ত্রাসের সৃষ্টি করছে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

**পাঁচ.** শাহাদাত প্রত্যাশীরা দীনের জন্য প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। তাই মানুষ তাদের সাফল্যের জন্যে দু'আ করে যেমন ওহুদের যুদ্ধে যাওয়ার সময় আবু সা'আদ খাইছামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আকুতি করেন, তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে, যাতে সে যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করে (Ibn Qayyim 1986, 365)। পক্ষান্তরে আত্মঘাতীরা অতি সংগোপনে লোক চক্ষুর আড়ালে থেকে কল্পিত শত্রুদের উপর আঘাত না করে নিরীহ নিরপরাধ মানুষের উপর আক্রমণ করে।

**ছয়.** শাহাদাত অর্জনকারী যুদ্ধের ময়দানেও উঁচুমানের চারিত্রিক ও নৈতিকতা প্রদর্শন করে (Abū Dāwūd 2009, 2/321, 2517)। সে জাতীয় কোন স্বার্থে আঘাত হানে না; ক্ষেত, ফসল, বৃক্ষ, তরু, জীব-জন্তু, মিল-ফ্যাক্টরি, জরুরী স্থাপনা, পুল, ব্রিজ ইত্যাদি ধ্বংস করে না। সে কখনো, মসজিদ, হাসপাতাল, কিংবা অমুসলিমদের ইবাদত ও ধর্মীয় নিদর্শন ধ্বংস করে না। কোন অবস্থাতেই সে অসহায় নারী শিশু, বৃদ্ধদের হত্যা করে না এবং তাদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন চালায় না (Haykal 2008, 1091-1433; Al-Qurṭubī 2003, 2/348; Riḍā 1994, 10/179-199)। পক্ষান্তরে এ সকল জাতীয় স্বার্থে আঘাত হানার জন্যই অধিকাংশ আত্মঘাতীরা হামলা করে থাকে।

**সাত.** শাহাদাত লাভকারীদেরকে সমাজে অত্যন্ত সম্মানের সাথে স্মরণ করা হয়, মানুষ তাদের মতো করে শাহাদাত লাভের জন্য আশা ও আকাঙ্ক্ষা করে, পক্ষান্তরে আত্মঘাতীদেরকে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ ঘৃণা করে।

**আট.** শাহাদাতের কামনা ঈমানের পূর্ণতাদানকারী এবং শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা বিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ নিফাকী নিয়ে মৃত্যুবরণ হিসেবে বিবেচিত (Muslim 1991, 6/49, 5040)। এজন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার শহীদ হবার আকাঙ্ক্ষা করেছেন (Muslim 1991, 6/33, 4967)। পক্ষান্তরে আত্মঘাতসহ অন্যান্য সকল পন্থায় মৃত্যু কামনা ইমানের পূর্ণতার পরিপন্থী (Al-Bukhārī 1422H, 5/2146, 5347)।

**নয়.** শাহাদাত শুধুমাত্র যুদ্ধের ময়দানে সর্বোচ্চ চেষ্টার মাধ্যমে শত্রুর মোকাবেলায় আমরণ লড়তে লড়তে অর্জিত হয়। এতে সুনিদিষ্ট কোন পরিকল্পনা থাকে না। তাই অনেক সাহাবী শহীদ হওয়ার চরম আকাঙ্ক্ষা নিয়েও যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় লড়ে গাজী হয়েছেন; কিন্তু শহীদ হননি। আবার কেউ শাহাদাতের আশায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে দোয়া চেয়েছেন; কিন্তু তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতিও তিনি পাননি। শুধু তাই নয়, শহীদ জানে না, কোন যুদ্ধে কখন কার আঘাতে সে শাহাদাত লাভ করবে। পক্ষান্তরে আত্মঘাতী হামলা একটি সুপরিকল্পতি আক্রমণ। এতে ঘটনার খুঁটিনাটি সব কিছু আক্রমণকারীর পরিকল্পনায় থাকে।

### ঘ. শরীয়া মাকাসিদের আলোকে আত্মঘাতী হামলা

শরীয়া মাকাসিদ কুরআন ও সুন্নাহ প্রদর্শিত মানব কল্যাণমূখী ইসলামী আইন দর্শনের (philosophy of law) নাম। এটি প্রচলিত আইন দর্শনের তুলনায় অধিক কল্যাণমুখী ও সামগ্রিক। এজন্য পাশ্চাত্যের আইন বিশেষজ্ঞগণ শরীয়া মাকাসিদের উপর গবেষণা শুরু করেছে এবং শরীয়া মাকাসিদের মর্মবাণীকে তাদের আইন দর্শনে অভিযোজন করার প্রয়াস চালাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে Felicitas Meta Maria Opwis (2001), David Johnston (2004), Bruce C. Gipson (2012), Nancy Roberts (2013) I Adis Duderija (2014) প্রমুখের গবেষণাকর্মগুলো উল্লেখযোগ্য। শরীয়া মাকাসিদের আলোকে আত্মঘাতী প্রতিবাদের পর্যালোচনার পূর্বে শরীয়া ও মাকাসিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক।

### শরীয়া মাকাসিদের পরিচয়

'শরীয়া মাকাসিদ' এর আরবী হচ্ছে مقاصد الشريعة। এটি মাকাসিদ (مقاصد) ও শারী'য়াহ (الشريعة) এর সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌগিক শব্দ। مقاصد বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে مقصد (মাকসাদ)। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে উদ্দীষ্ট ও গন্তব্য; মানুষ যা কিছু উদ্দেশ্য করে থাকে কিংবা যে গন্তব্যে পৌঁছাতে চায়। এছাড়া মাকাসিদের শব্দমূল قصد ইচ্ছা, সরল পথ, মধ্যম পন্থা এবং ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি অর্থকেও শামিল করে (Al-Firūzābadī 1952, 3/45-46; Ibn Fāris 1970, 3/262; Al-Isfahānī ND, 259; Al-Zubaydī 1391H, 9/39; Ibn Manjūr 1992, 11/179)।



শরীয়া (شريعة) শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন: সরল পথ, পদ্ধতি, পন্থা, আইন, বিধান, পানির ঝর্ণা বা ঘাট ইত্যাদি (Al-Zubaydī 1391H, 9/259)। পারিভাষিক সংজ্ঞায় ইমাম রাগিব বলেন:

> هي ما شرع الله تعالى لعباده من الدين.
>
> আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যে জীবন ব্যবস্থা (দীন) প্রণয়ন করেছেন, তাই শরীয়া (Al-Isfahānī ND, 262)।

তাজুল আরুস ও আন-নিহায়াহ গ্রন্থদ্বয়েও অনুরূপ অভিব্যক্তির উল্লেখ রয়েছে (Al-Zubaydī 1391H, 9/259; Ibn al-Athīr 2002, 2/413)। আধুনিক যুগে শরীয়া শব্দটি বিশেষত দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন অর্থে, এটি ইসলামের মৌলিক ও শাখা-প্রশাখা এবং তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সকল দিককে শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করে (Al-Badawī 2000, 522)। দ্বিতীয়ত শরীয়া ফিকহ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ফিকহ অর্থে শরীয়া দ্বারা ইসলামের শুধু প্রায়োগিক বিষয়সমূহকে বুঝানো হয়, যা ইবাদাত, মুয়ামালাত বা ব্যবসায়িক লেনদেন, পারিবারিক নীতিমালা, সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র পরিচালনা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে (Al-Qaradāwī 2008, 19-20)। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুঝা যাচ্ছে, ইসলামের আইনগত দিককেই (Islamic Law) শরীয়া বলা হয়। তবে এটি প্রচলিত আইন ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন এবং অধিকতর সুষ্ঠু ও কার্যকর। এর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাকে প্রচলিত সব আইন ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠতর করে রেখেছে (Al-Raysūnī 1999, 10)।

প্রতিটি আসমানী গ্রন্থেই সমকালীন মানব সমাজকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিধিবিধান ছিল। এ বিধিবিধানগুলোই মূলত 'শরীয়া' (شريعة) হিসেবে আখ্যায়িত। সকল শরীয়ার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধনে দিক নির্দেশনা প্রদান করা। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী রহ. [১২১৪-১২৭৩ খ্রি.] বলেন:

> ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية.
>
> বিচক্ষণ স্কলারগণ এ ব্যপারে একমত যে, নবী-রাসূলগণের আনীত শরীয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টির ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধন করা (Al-Qurtubī 2003, 2/6)।

ইমাম শাতিবীও রহ. [১৩২০-১৩৮৮খ্রি.] এমন অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। (Al-Shātibī 1997, 1/221)। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ স. এর আনীত জীবনবিধান 'ইসলামী শরীয়া' (শারী'য়াহ ইসলামিয়্যাহ) হিসেবে পরিচিত। ইসলামী শরীয়া মানবকল্যাণ নিশ্চিতকরণে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোকে সংরক্ষণ করতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। যে সব মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে মানবকল্যাণ নিশ্চিতকরণের এই মহান লক্ষ্য সাধিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে ইসলামী

আইনে 'মাকাসিদুশ্ শারী'য়াহ' বা 'ইসলামী শরীয়ার মৌলিক উদ্দেশ্য' অথবা 'শরীয়া মাকাসিদ' (Objectives of Sharīah / Objectives of Islamic Law) বলা হয়।

শরীয়া মাকাসিদের পারিভাষিক সংজ্ঞায় ইবনে আশুর [মৃ. ১৮৭৯-১৯৭৩খ্রি.] বলেন:

> هي المعاني والحكم الملحوظة في جميع أحوال التشريع او معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.
>
> ইসলামী শরীয়ার সাধারণ মাকাসিদ (مقاصد عامة/ General Objectives) হচ্ছে, এমন কিছু অন্তর্নিহিত গূঢ়তত্ত্ব ও রহস্য, যা শরীয়তের সকল কিংবা অধিকাংশ অবস্থায় এমনভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, তা শরীয়াতের বিধিবিধানের (أحكام/ Rulings and Provisions) বিশেষ কোন প্রকরণে সীমাবদ্ধ থাকে না (Ibn 'Āshūr 2001, 1/171)

আহমাদ আল-রাইসূনী (জ. ১৯৫৩খ্রি.) শরীয়া মাকাসিদকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে:

> إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت لاجل تحقيقها لمصلحة العباد.
>
> মাকাসিদ আশ্-শারী'য়াহ হচ্ছে মানব কল্যাণমুখী সে সব উদ্দেশ্য, যেগুলো অর্জনের জন্য শরীয়ত প্রণীত হয়েছে (Al-Raysūnī 1995, 19)।

উল্লেখিত সংজ্ঞা দুটির আলোকে স্পষ্ট হল যে, ইসলামের প্রায় সকল বিধান ও নির্দেশনায় আল্লাহ তা'আলার মানব কল্যাণমুখী কিছু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আছে, এ সকল উদ্দেশ্যকেই মাকাসিদুশ্ শারী'য়াহ বলে। এ সকল বিধিবিধান যথাযথভাবে পালিত হলে শরীয়া প্রণয়নের উদ্দেশ্য হাসিল হবে এবং পরিণতিতে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত হবে। আল্লাহ তা'আলার এ সকল উদ্দেশ্যই শরীয়া মাকাসিদ হিসেবে পরিচিত।

ইসলামী শরীয়ার এমন মানবকল্যাণ দর্শনের ব্যাপারে পরবর্তী সকল নির্ভরযোগ্য স্কলার ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. [১২৯২-১৩৪৯খ্রি.] এর মতে শরীয়ার মূলসূত্র ও ভিত্তি হচ্ছে, অন্তর্নিহিত রহস্য ও প্রজ্ঞা (হিকমাহ) এবং মানুষের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধন। শরীয়া পুরোটাই ন্যায়, অনুগ্রহ, প্রজ্ঞা এবং কল্যাণে ভরপুর। সুতরাং যে কোন বিষয় ন্যায়পরায়ণতা বহির্ভূত হয়ে অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়লে, অনুগ্রহ বিচ্যুত হয়ে রুঢ় হলে, কল্যাণ বিচ্যুত হয়ে অকল্যাণে পরিণত হলে এবং উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে অনর্থক হয়ে পড়লে সেটি আল্লাহর শরীয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও [কারো কারো মতে] সেটিকে ব্যাখ্যার (تأويل) মাধ্যমে শরীয়ার গণ্ডির মধ্যে বিবেচনা করা হয় (Ibn Qayyim 1998, 3/3)। শাহ ওয়ালীউল্লাহ আদ্ দেহলভী রহ. [১৭০৩-১৭৬২খ্রি.] বলেন, যদি এমন ধারণা পোষণ করা হয় যে, শরীয়াতের বিধিবিধান ও আহকাম কোন ধরনের মানব কল্যাণমূখী নয়, তবে এটি এমন এক ভুল ধারণা, যা রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ এবং সোনালী যুগের (خير القرون) ইজমা'র (সমকালীন সকল আলিমের ঐকমত্য) মাধ্যমে ভ্রান্ত



হিসেবে প্রমাণিত (Al-Dehlawī 2005, 1/27)। অতএব, শরীয়া মাকাসিদের ভিত্তিতে যে বিধান রচিত হয়, তা সকল মানুষের কল্যাণ সাধনে সক্ষম।

ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলামের প্রায় সকল বিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এ সকল উদ্দেশ্যের মর্মবাণী হচ্ছে মানব কল্যাণ সাধন করা, যদিও মুজতাহিদগণ সকল বিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এখনও উৎঘাটন করতে সক্ষম হননি। ইসলামী বিধানের অন্তর্নিহিত সকল উদ্দেশ্য ও কল্যাণ গুরুত্বের বিবেচনায় তিন স্তরে বিভক্ত সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে অপরিহার্য (الضروريات / essentials), প্রয়োজনীয় (الحاجيات/ necessities), ও সৌন্দর্যবর্ধক (التحسينيات/ embelishments) (Al-Ghazālī 1/286-293)। এ ছাড়া প্রতিটি স্তরের রয়েছে কতিপয় পরিপূর্ণতা দানকারী কল্যাণ যেগুলো (المكملات/ complementary) হিসেবে বিবেচিত। শরীয়ার অপরিহার্য কল্যাণকে (الضروريات / essentials) স্কলারগণ সামগ্রিক ও সর্বজনীন কল্যাণ (الكليات /universals) বা সাধারণ কল্যাণ (المصالح العامة /public benefits) হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। 'পাঁচ অপরিহার্য উদ্দেশ্য ছাড়া শরীয়ার প্রত্যেকটি বিধানেরও রয়েছে নিজস্ব অন্তর্নিহিত কিছু উদ্দেশ্য, যেগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য/ কল্যাণ (المصالح الخاصة /specific benefits) ও আংশিক উদ্দেশ্য/ কল্যাণ (المصالح الجزئية /partial benefits) হিসেবে পরিচিত।

শরীয়ার সকল বিধানের সামগ্রিক ও সর্বজনীন কল্যাণসমূহ পাঁচটি, সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ১) দ্বীন রক্ষা, ২) জীবন রক্ষা, ৩) বংশ রক্ষা, ৪) সম্পদ রক্ষা ও ৫) ধীশক্তি রক্ষা। এগুলো একসাথে 'পঞ্চ অপরিহার্যতা' (الضروريات الخمسة/five necessities) ও 'পঞ্চ সর্বজনীনতা' (الكليات الخمسة/five universals) হিসেবে আখ্যায়িত। আরো সাবলীলভাবে এগুলোকে ইসলামী শরীয়ার 'পাঁচ অপরিহার্য উদ্দেশ্য' কিংবা 'পাঁচ অপরিহার্য কল্যাণ'ও বলা যেতে পারে। এছাড়া শরীয়ার প্রত্যেকটি বিধানের নিজস্ব অন্তর্নিহিত কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। শরীয়ার সামগ্রিক উদ্দেশ্য মূলত মানুষের মৌলিক চাহিদা ও অধিকারকে কেন্দ্র করেই নির্ধারিত হয়েছে। তবে শরীয়া মাকাসিদ ভিত্তিক প্রণীত মানুষের মৌলিক অধিকার জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মৌলিক অধিকার যথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার চেয়ে অধিকতর ব্যাপক ও কার্যকর। কারণ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা এই চারটি শরীয়ার প্রথম উদ্দেশ্য 'জীবন রক্ষা'র মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। আর শিক্ষা শরীয়ার পঞ্চম উদ্দেশ্য 'ধীশক্তি রক্ষা'র মধ্যে গণ্য। অধিকন্তু শরীয়া দীন রক্ষা, বংশ রক্ষা ও সম্পদ রক্ষা এই তিনিটি উদ্দেশ্যের মাধ্যমে মানুষের সমগ্র মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করেছে। মূলত এই তিনটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত না হলে অন্য দুটি উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। ইমাম শাতিবী বলেন, মানুষের অপরিহার্য মৌলিক চাহিদা পাঁচটি যথা: দ্বীন রক্ষা (حفظ الدين/ protection of deen/ religion), জীবন রক্ষা

(حفظ النفس/ protection of life), বংশ রক্ষা (حفظ النسل/protection of progeny), সম্পদ রক্ষা (حفظ المال/ protection of property), এবং ধীশক্তি রক্ষা (حفظ العقل/ protection of intellect)। তার পূর্ববর্তী অনেক স্কলার মনে করেন, এই পাঁচটি অপরিহার্য মৌলিক চাহিদা প্রত্যেক মিল্লাতেই (নবীর উম্মতে) সমপরিমাণ গুরুত্বের সাথে সংরক্ষণ করা হয়েছে (Al-Shātibī 1997, 1/31)। শাতিবীর পূর্বে ইমাম গাযালী বলেন, সৃষ্টির কল্যাণে নিবেদিত যে কোন জাতি (মিল্লাত) কিংবা শরয়ী বিধান (শরীয়ত) এই পাঁচটি মূলনীতি শূন্য হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এজন্য কুফরী, মানুষ হত্যা, ব্যভিচার, চুরি ও মদ্যপান ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ (হারাম) ঘোষণার ক্ষেত্রে কোন শরীয়া দ্বিমত পোষণ করেনি (Al-Gazālī 1413H, 174)।

**শরীয়া মাকাসিদের আলোকে আত্মঘাতী হামলা**

আত্মঘাতী হামলা শরীয়ার অন্তর্নিহিত রহস্য ও প্রজ্ঞা এবং মানুষের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের পরিপন্থী। কারণ আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে ব্যক্তি পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য- আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যকে ব্যাহত করে। সকলেই তাদের পার্থিব জীবনের কল্যাণ হাসিল থেকে বঞ্চিত হয়। পরকালীন জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয়কৃত মানুষের জীবনকে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় মানুষের নিকট আমানত রেখেছেন। আত্মঘাতী হামলাকারী এই আমানতকে চিরতরে বিনষ্ট করে ফেলে। অধিকন্তু আত্মহত্যা ও মানব হত্যার অপরাধের শাস্তি স্বরূপ পরকালের চূড়ান্ত কল্যাণ থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করে।

আত্মঘাতী হামলা শরীয়ার 'পঞ্চ অপরিহার্যতা' (الضروريات الخمسة/five necessities) এর দ্বিতীয়টি- জীবন রক্ষা (حفظ النفس/ protection of life) এর সম্পূর্ণ বিপরীত বিধায় এটি আবশ্যকীয়ভাবে সর্বাগ্রে বর্জিত কাজ। জীবন রক্ষার বাস্তবায়নে ইসলামী শরীয়া নানা রকম বিধান আরোপ করেছে। তন্মধ্যে কিছু বিধান জীবন রক্ষার জন্য অপরিহার্যভাবে করণীয় (المأمورات) এবং কিছু বিধান অপরিহার্যভাবে বর্জনীয় (المنهيات)। এভাবে করণীয় ও বর্জনীয় বিধানের মাধ্যমে ইসলাম জীবন রক্ষা করাকে অপরিহার্য করেছে। তাই জীবন রক্ষায় সর্বাধিক চেষ্টা ও লড়াই করা মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য।

এমন হত্যাকাণ্ড ইসলামী শরীয়ার ন্যায়পরায়ণতা (العدل /Justice) ও স্বাধীনতা (الحرية /Freedom) এই দুইটি সাধারণ কল্যাণ (المصالح العامة /public benefits) কে ব্যাহত করে। কারণ আত্মঘাতী হামলাকারী আত্মহত্যা ও মানব হত্যার মাধ্যমে স্বীয় আত্মা ও অন্যদের প্রতি চরম জুলুম করে থাকে এবং তাদের বেঁচে থাকার স্বাধীনতাকে হরণ করার মাধ্যমে সকলের জীবনকে এই পৃথিবীতে উদ্দেশ্যহীন করে তুলে।



আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের নিরপরাধ আত্মা ও একাধিক মানুষকে হত্যার মাধ্যমে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে থাকে। এমন হত্যাকাণ্ড ইসলামসহ সকল শরীয়ার (ধর্মীয় বিধানের) অপরিহার্য সামগ্রিক উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বিধায় কোন শরীয়াই এর অনুমোদন দেয় না। অধিকন্তু এমন হত্যাকাণ্ড দমনে ইসলাম সর্বাধিক বিধান প্রণয়ন করেছে এবং হত্যাকাণ্ড ঘটে গেলে অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করেছে।

**৩। আত্মঘাতী হামলা রোধে বাস্তব পদক্ষেপ**

আসমানী সকল জীবন বিধানের (শরীয়ার) মধ্যে ইসলাম সর্বশেষ এবং একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনপদ্ধতি। আত্মঘাতী আক্রমণ দমনেও ইসলামের রয়েছে যথোপযুক্ত নির্দেশনা। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, ইসলাম মানুষের আত্মিক উন্নয়ন ও বস্তুগত উন্নয়ন দুই দিককেই সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। আবার যে কোন সমস্যার সমাধানে ইসলাম ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উভয় দায়িত্বকেই সমভাবে বিচার করেছে। তাই যে কোন সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজের মানুষের সামষ্টিক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আত্মঘাতী হামলা দমনে সমাজের চার স্তরের মানুষের দায়িত্বশীল ভূমিকা অনস্বীকার্য, সেগুলো হচ্ছে পরিবার, শিক্ষাঙ্গন, মসজিদ ও রাষ্ট্র।

**পরিবারের ভূমিকা**

পরিবার থেকেই একটি শিশু তার জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার শিক্ষা এবং চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করে থাকে। যদিও এসকল বিষয় শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা দেয়া সম্ভব, কিন্তু এ ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকাই মুখ্য। কারণ শিশুদের জীবনের সকল বিষয়ে, বিশেষত কোন ধরনের শিক্ষা সে গ্রহণ করবে, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তের অধিকার পরিবারই বেশি রাখে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের, বিশেষত মাতা-পিতার দায়িত্ব হচ্ছে তাদের সন্তানদেরকে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও চারিত্রিক গুণাবলি শিক্ষা দেয়া।

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ؟ حَتَّى يُسْأَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ.«

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে (বিচার দিবসে) প্রশ্ন করবেন; সে কি তার যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণ করেছে? নাকি তার প্রতি অবহেলা করেছে? এমনকি গৃহকর্তার নিকট থেকে তার পরিবারের লোকদের বিষয়েও কৈফিয়ত নেবেন (Al-Nasā´i 1991, 5/374, 9174)।

পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শিক্ষাঙ্গন। তাই কুরআন ও সুন্নাহর বহু স্থানে বিবাহের গুরুত্ব ও পারিবারিক নীতি সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মাতা-পিতার কর্তব্য হচ্ছে, তাদের সন্তানদের এমন শিক্ষা দেয়া যে, পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইবাদত ও জীবনকর্মে তাঁর নির্দেশের আনুগত্য করা; অন্যের

রক্ত ঝরানো যাবে না; এমনকি বরং অন্যকে যে কোন ধরনের শারীরিক ও মানসিক আঘাত দেয়া যাবে না; প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার সমান; উগ্রতা ও সাম্প্রদায়িকতা মানব সভ্যতার পরিপন্থী; মানুষের নিজের প্রতিও কোন ধরনের অমানবিক আচরণ করার অধিকার নেই; আত্মহত্যা ও আত্মঘাতী হামলা সর্বোচ্চ অপরাধ এবং এর ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তিও সর্বোচ্চ। পাশাপাশি কোন ধরনের শিশুকে সে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, সে বিষয়েও মাতা-পিতাকে পরামর্শ দিতে হবে। সর্বোপরি পারিবারিক লালন-পালনের মাধ্যমে একটি শিশুকে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারলে আত্মঘাতী হামলা বন্ধ হবে।

**শিক্ষাঙ্গনের ভূমিকা**

পারিবারিক লালন-পালনের পাশাপাশি একটি শিশুর মেধা ও মনন বিকাশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যে কোন বিষয়ের জ্ঞানগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিশুরা পেয়ে থাকে। পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার, জীবনের নিরাপত্তা, মানব জীবনের মর্যাদা ও এর সুরক্ষার গুরুত্ব, মানব হত্যার দণ্ডবিধি, সমাজের শৃঙ্খলা বিধানে নাগরিক দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেয়া জরুরী। এ ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীসে শরীফে এসেছে:

عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ « لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ». ويشير إلى صدره ثلاث مرات « بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.«

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর ধোকাবাজি করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অগোচরে শত্রুতা করো না এবং একে অন্যের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয়ের চেষ্টা করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকো। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর অত্যাচার করবে না, তাকে অপদস্ত করবে না এবং হেয় প্রতিপন্ন করবে না। তাকওয়া এখানে, এ কথা বলে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার তাঁর বক্ষের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। প্রত্যেক মুসলিমের উপর প্রত্যেক মুসলিমের জান, মাল, সম্মান হারাম (Muslim 1991, 8/18, 6743)।



তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে যে, ইসলাম সকল প্রকার মানব হত্যাকে নিষিদ্ধ করেছে এবং মানব হত্যার সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করেছে। শিক্ষাঙ্গনের এমন ভূমিকা আত্মঘাতী হামলা রোধে অবদান রাখতে পারে।

**মসজিদের ভূমিকা**

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলাম প্রবর্তিত মসজিদ ব্যবস্থা নৈতিকা ও মূল্যবোধের শিক্ষাদানে স্বতন্ত্র একটি শিক্ষাঙ্গনের ভূমিকা পালন করে। এ জন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে সমাজ পরিবর্তনে মসজিদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। মসজিদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে কারঈন, আল-আযহার ও যাইতুনার মত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্র এবং উদারতা ও মধ্যম পন্থার প্রতিনিধিত্বকারী পৃথিবী বিখ্যাত কিছু বিশ্ববিদ্যালয়। তাই যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তাদের পাশাপাশি সর্বসাধারণের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মসজিদ। মসজিদে জুমার খুৎবার প্রতি ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। মুসল্লিদের উপর জুমার খুৎবার প্রভাবও লক্ষণীয়। তাই জুমার খুৎবার প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে মানব জীবনের মর্যাদা এবং আত্মহত্যা, মানব হত্যা ও আত্মঘাতী হামলা এমন অপরাধের ভয়াবহতা ও পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অভিহিত করতে হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় উপলক্ষে মসজিদ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ ধরনের বিষয়ে আলোচনা করে মানুষকে অবহিত করলে আত্মঘাতী হামলার প্রবণতা কমতে পারে।

**রাষ্ট্রের ভূমিকা**

আত্মঘাতী হামলা দমনে রাষ্ট্রের ভূমিকাই সর্বাপেক্ষা বেশি কার্যকর; তাই রাষ্ট্রকেই এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা রাখতে হবে। বিচার বিভাগের মাধ্যমে মানব হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। অল্প সংখ্যক অপরাধীর বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ ধরনের বহু সংখ্যক অপরাধীকে দমিয়ে রাখাই মূলত প্রচলিত যে কোন দণ্ডবিধির উদ্দেশ্য। শরীয়া মাকাসিদেও অপরাধ দমনই দণ্ডবিধির মর্মবাণী।

মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার, জীবনের নিরাপত্তা, মানব জীবনের মর্যাদা ও এর সুরক্ষার গুরুত্ব, মানব হত্যার দণ্ডবিধি, সমাজের শৃঙ্খলা বিধানে নাগরিক দায়িত্ব এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এ সব বিষয়কে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষাই যথেষ্ট গুরুত্বের দাবীদার। কারণ ইসলামই মানব জীবনের মর্যাদাকে বুলন্দ করেছে; পাশাপাশি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ, আইনের প্রজ্ঞা এবং মানবতার কল্যাণকে সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিয়েছে (Al-Jawziyyah 1998, 3/3)। শরীয়া মাকাসিদের মুল বক্তব্য হচ্ছে, কল্যাণকর সব কিছু অর্জন এবং ক্ষতিকারক সব কিছু বর্জনের মাধ্যমে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য বয়ে আনা (Monawer 2017, 52)। তাই আত্মঘাতী হামলা দমনে কার্যকরী পদক্ষেপ একান্তভাবেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

আত্মঘাতী হামলা শুধুমাত্র একটি জাতীয় সমস্যা নয়; বরং এটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যাও বটে। তাই স্থান, কাল ও পাত্রভেদে এর কারণেও ভিন্নতা থাকে। রাষ্ট্র আত্মঘাতী হামলার সুনির্দিষ্ট কারণগুলো চিহ্নিত করে এর সমাধানকল্পে পদক্ষেপ নিলে আত্মঘাতী হামলা দমন করা যেতে পারে। আত্মঘাতী প্রতিবাদের কারণ চিহ্নিতকরণে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গবেষণা করানো যেতে পারে। কারণ একাডেমিক গবেষণার মাধ্যমেই যে কোন সমস্যার সঠিক ও সুনির্দিষ্ট কারণ শনাক্ত হয় এবং এর সমাধানের পথ উন্মোচিত হয়।

আত্মঘাতী হামলা বন্ধকরণে রাষ্ট্র মিডিয়াকে ব্যবহার করতে পারে। কারণ মিডিয়ার প্রভাবে আজ বহু ধরনের অপরাধ সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। এর মাধ্যমেই মানুষ অনেক তথ্য পাচ্ছে এবং অনেক কিছু শিখছে। মিডিয়া মানুষের ধারণা ও বিশ্বাস পরিবর্তনে লক্ষণীয় ভূমিকা রাখছে। তাই আত্মঘাতী হামলা দমনে রাষ্ট্র মিডিয়ার ইতিবাচক ভূমিকাকে নিশ্চিত করতে পারে। মিডিয়ার মাধ্যমে আত্মঘাতী হামলার কারণ, দণ্ডবিধি এবং এর দমনের বিভিন্ন উপায় প্রচার করার মাধ্যমে এ ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তবে এমন ঘটনার খুঁটিনাটি প্রচারে রাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা থাকতে হবে; কারণ মিডিয়া কর্তৃক কোন ঘটনার খুঁটিনাটির বিস্তারিত বিবরণ মানুষের মাঝে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর মাধ্যমেই অপরাধপ্রবণ মানুষেরা নতুন নতুন কৌশল শিখে নেয় এবং নিজেদের স্বার্থ হাসিলে কাজে লাগায়। আত্মঘাতী হামলা রোধে মিডিয়ার ইতিবাচক ভূমিকা হিসেবে অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টদের আইনি শাস্তি, এ ব্যাপারে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং মানব হত্যাকারীদের বিচার ও শাস্তির সংবাদ প্রচার করা যেতে পারে; যাতে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীর বিচার অন্য অপরাধীদের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে। সর্বোপরি আত্মঘাতী হামলা দমনে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের ইতিবাচক ভূমিকাকে একমাত্র রাষ্ট্রই নিশ্চিত করতে পারে। আত্মঘাতী দমনে উল্লেখিত চার স্তরের ভূমিকা নিচের চিত্র-৩ এর মাধ্যমে অনুধাবন করা যেতে পারে।

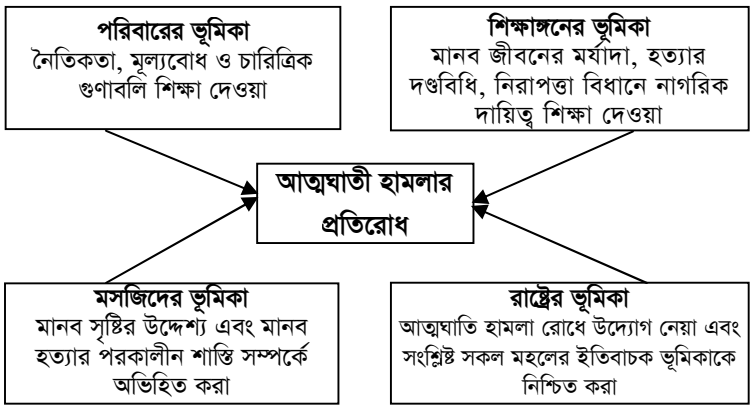


চিত্র-৩: আত্মঘাতী হামলার প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান



**উপসংহার**

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবনের মর্যাদা ও আত্মঘাতী হামলা শীর্ষক এই প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম মানুষের দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; তার জান, মাল, দীন, বিবেক-বুদ্ধি, ও পরিবারসহ সকল কিছুর সংরক্ষণের বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে তাদেরকে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত করেছে। ইসলাম মানবজীবন সুরক্ষায় হালাল পানাহারের নির্দেশ দিয়েছে; বৈধ বিবাহ প্রথার নির্দেশনা দিয়েছে; পারিবারিক শৃঙ্খলা ও অর্থায়নের বিধান রচনা করেছে; অনন্যোপায়ে জীবন বাঁচাতে নিষিদ্ধ পানাহারের অনুমোদন দিয়েছে; আক্রান্ত হওয়ার আগেই রোগ প্রতিরোধের নির্দেশনা দিয়েছে; আত্মরক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। পাশাপাশি জীবন সুরক্ষার পরিপন্থী অবৈধ যৌনাচারকে ইসলাম হারাম করেছে; মানব হত্যাকে সর্বোচ্চ অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং মানুষের দৈহিক ক্ষতিসাধনকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আত্মঘাতী হামলার নিষিদ্ধকরণে ইসলাম আত্মহত্যা, মানব হত্যাসহ সকল প্রকার হত্যাকে সর্বোচ্চ বড় অপরাধের তালিকায় এনে এটিকে কুফরি হিসেবে আখ্যায়িত দিয়েছে। শুধু তাই নয় বরং হত্যার সহায়ক সকল কাজকে হারাম করেছে। পাশাপাশি মানব হত্যার যথোপযুক্ত দণ্ডবিধি রচনা করেছে।

এটিও প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন আসমানী ধর্মই আত্মহত্যার অনুমোদন দেয় না। অধিকন্তু আত্মহত্যা প্রতিরোধে ইসলাম ফরয 'ইবাদতে রুখসাতের বিধান করেছে; ঔষধ গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছে; প্রাণ রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টার নির্দেশ দিয়েছে; এমনকি শাহাদাত কামনায় জিহাদের ময়দানেও আত্মঘাতীর ব্যাপারে সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বনসহ ইমামের আনুগত্যকে ফরয করেছে।

শাহাদাত ও আত্মঘাতী হামলার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম সকল দিকে থেকেই শাহাদাত ও আত্মঘাতী হামলা দুটি কখনই এক নয় বরং ভিন্ন বিষয়। আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়। এটি মানুষের সর্বোচ্চ মৌলিক অধিকার জীবন সুরক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত করে। তাই আত্মঘাতী হামলা সকল আসমানী বিধানের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

আত্মঘাতী হামলা প্রতিরোধে মাতা-পিতা পারিবারিকভাবে শিশুদেরকে নৈতিকতা, ইসলামী মূল্যবোধ ও চারিত্রিক গুণাবলি শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মানব জীবনের মর্যাদা, মানব হত্যার দণ্ডবিধি, ও নিরাপত্তা বিধানে নাগরিক দায়িত্ব শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। মসজিদে জুমার খুৎবা ও অন্যান্য উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনায় খতীবগণ মুসল্লিদেরকে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং মানব হত্যার পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে অভিহিত করবে। আত্মঘাতী হামলা রোধে রাষ্ট্র কর্তৃক মিডিয়া ও গবেষকদের মাধ্যমে এর সুনির্দিষ্ট কারণসমূহ শনাক্ত করে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের ইতিবাচক ভূমিকাকে নিশ্চিত করা সময়ের দাবি।

## Bibliography


Al-Qurʾān

ʻAbdullāh, Ibn Aḥmad Ibn Ḥambal. 1981. *Masāʾilu Aḥmad Ibn Ḥambal Riwāyatu Ibnihī ʻAbdullāh.* Beirūt: al-Maktabul Islāmī.

ʻAbīd, Islām. 2015. "Al-Intiḥār*: Dirāsatun Muqāranatun baynash Sharīʻatil Islāmiyyati wal Qawānīnil Waḍʻiyyah (al-Jazāʼir-Faransā)."* MA, Sharīʻah, Shahīd Ḥammah Lakhḍar University- Al-Wādī.

Abu Dāwūd, Sulaymān Ibn Ashʻash Ibn Isḥāq Ibn Bashīr Ibn Shaddād Ibn ʻAmr al-Azdī al-Sijistānī Abū. 2009. *Sunanu Abī Dāwūd*. 1st ed. Beirūt: Dār al-Risālah al-ʻĀlamiyyah.

Aḥmad, Abū ʻAbdullāh Ibn Muḥammad Ibn Ḥambal Ibn Hilāl Ibn Asad Ashshaybānī. 1995. *Musnadul Imām Aḥmad Ibn Ḥambal*. 1st ed. Vol. 8. Cairo: Dārul Ḥadīth.

Al-Aṣfahānī, Abul Ḥusayn Ibn Muḥammad al-Rāghib. n.d. *Al-Mufradāt*. Beirūt: Dārul Maʻrifah.

Al-Badawī, Yūsuf Aḥmad Muḥammad. 2000. *Maqāṣid al-Sharīʻah ʻinda Ibn Taymiyyah*. Jordan: Darun Nafāʼis.

Al-Bahūtī, Manṣūr Ibn Yūnus Ibn Idrīs. 1402H. Kashshāful Qannāʻ ʻan Matanil Iqnāʼ. 6 vols. Beirūt: Dārul Fikr.

Al-Bukhārī, Imām Abū ʻAbdullah Muḥammad Ibn Ismāʻīl al-Juʻfī. 1422H. *Al-Jāmiʻal- Ṣaḥīḥ*. 1st ed: Dāru Ṭaqin Najāh.

Al-Ḍamūr, Adnān Muḥammad. 2010. *Dawrul ʻAwāmilil Ijtimāʻiyyati wal Iqtiṣādiyyati wan Nafsiyyati fī Tafsīri Ẓāhiratil Intiḥāri fil Urdun.* MA, Social Science, Jāmiʻatu Mūtah.

Al-Dāyah, ʻAbdullāh Salmān. 2016. *Al-Muwāzanatu bayna Ḥifzin Nafsi wa Halakatihā fil Jihādi fī Sabīlillāh.* MA, Comparative Fiqh, The Islamic University–Gaza.

Al-Dehlawī, Shah Waliyyullāh Ibn ʻAbdur Raḥīm. 2005. *Ḥujjatullāhil Bālighah.* Beirūt: Dārul Jīl.





Al-Dimashqī, Ṣadruddīn ʻAlī Ibn ʻAlī Ibn Muḥammad Ibn Abil ʻIzz. 1418H. *Sharḥul ʻAqīdatiṭ Ṭaḥāwiyyah.* 2nd ed. Beirūt: Muʼassasatur Risālah.

Al-Fawwāz, Khālid Ibn ʻAbdul ʻAzīz. 2009. *Al-ʻAmaliyyātul Intiḥāriyyatu wa Ṣilatuhā bil Istishhād: Dirāsah Taʼṣīliyyah Muqāranah.* MA, Jāmiʻatu Nāyif al-ʻArabiyyah lil ʻUlūmil Amniyyah, Riyāḍ.

Al-Fīrūzābādī, Muḥammad Yaʻqūb. 1952. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. cairo: Maṭbaʻat al-Bābī al-Ḥalabī.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad. 1413H. *Al-Mustaṣfā fī Ilmil Usūl*. Beirūt: Dārul Kutubil ʻIlmiyyah.

Al-Ḥaṭṭāb, Shamsuddīn Abū ʻAbdullāh. 1992. *Mawāhibul Jalīl fī Sharḥi Mukhtaṣaril Khalīl*. 3rd ed. Beirūt: Dārul Fikr.

Al-Jaṣṣāṣ, Abū Bakr Aḥmad Ibn ʻAlī al-Rāzī. 1992. *Aḥkām al-Qurʼān*. Beirūt: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī.

Ibnul-Jawzī, Jamāluddīn ʻAbdur Raḥmān Ibn ʻAlī Ibn Muḥammad. 1404H. *Zādul Masīr fī Ilmit Tafsīr*. 3rd ed. 9 vols. Beirūt: Al-Maktabul Islāmī.

Al-Kāsānī, ʻAlāuddīn Abū Bakr Ibn Masʻūd Ibn Aḥmad. 1986. *Badāʼiʻuṣ Ṣanāʼiʻ fī Tartībish Sharāʼiʻ*. 2nd ed. Beirūt: Dārul Kutubil ʻIlmiyyah.

Al-Mubārakpūrī, Abul ʻAlā Muḥammad ʻAbdur Raḥmān Ibn ʻAbdur Rahīm. 2010. *Tuḥfatul Aḥwadhi bi Sharhi Jāmiʻit Tirmidhī.* Vol. 10. Beirūt: Dārul Kutubil ʻIlmiyyah.

Al-Mubayyaḍ, Muḥammad Aḥmad. 2005. *Maṣlahatu Ḥifzun Nafsi fish Sharīʻatil Islāmiyyah*. 1st ed. Cairo: Muʼssasatul Mukhtār.

Al-Nasāʼī, Aḥmad Ibn Shuʻayb Abū ʻAbdir Raḥman. 1991. *Sunanun Nasāʼi Al-Kubrā.* 1st ed. 6 vols. Beirūt: Dārul Kutubil ʻIlmiyyah.

Al-Nashshār, ʻAlī Sāmī. 1983. *Shuhadāʼul Islāmi fī ʻAhdin Nubuwwah*. Cairo: Dārus Salām.

Al-Nawawī, Abū Zakariyya Yaḥyā Ibn Sharaf Ibn Murrī. 1985. *Rawḍatuṭ Ṭālibīn wa ʿUmdatul Muftīn*. 2nd ed. Beirūt: al-Maktabul Islāmī.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. 2008. *Al-Ijtihādu wa al-Tajdīdu bayna al-Ḍawābiṭ al-Sharʿiyyah wa al-Ḥājātil Muʿāṣarah*. In Kitābul Ummah. Duha: Ministry of Religious Endowment and Islamic Affairs.

Al-Qurṭubī, Abū ʿAbdullāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Bakr Ibn Farah al-Anṣārī Shamsuddin. 2003. *Al-Jāmiʿu li Aḥkāmil Qur´ān*. Riyāḍ: Dāru ʿAlamil Kutub.

Al-Raysunī, Aḥmad. 1995. *Naẓariyyatul Maqāṣid ʿinda al-Shāṭibī*. London: International Institute of Islamic Thought.

Al-Raysūnī, Aḥmad. 1999. *Al-Fiqhul Maqāsidī: Qawaʿiduhū wa Fawa´iduh*. Al-Rabāṭ: Maṭbaʿat al-Najāat al-Jadīdah.

Al-Sarakhsī, Shamsuddīn. 1978 *Al-Mabsūṭ*. 3rd ed. Beirūt: Dārul Maʾrifah.

Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsa al-Lakhmī al-Gharnāṭī. 1997. *Al-Muwāfaqāt fī Usūl Al-Sharīʿah*. Cairo: Dāru Ibnu ʿAffān.

Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati. 1997. *al-Muwafaqat fi Usulil Fiqh*. Edited by Bakr Ibn Abdullah Abu Zayd. 1st ed. KSA: Daru Ibn 'Iffan.

Al-Ṭabarī, Muḥammad Ibn Jarīr Ibn Yazīd Ibn Kathīr Ibn Ghālib al-Āmilī Abū Jaʾfar. 2000. *Jāmiʿul Bayāni fī Ta´wīlil Qur´ān*. Aḥmad Muḥammad Shākir ed. Vol. 24. Beirūt: Mu´ssasatur Risālah.

Al-Tirmidhī, Abū ʿĪsā Muḥammad Ibn ʿĪsā Ibn Sawrah Ibn Mūsā Ibn al-Ḍaḥḥāk. 1975. *Sunanut Tirmidhī*. 3rd ed. Miṣr: Muṭbiʿatul Bābil Ḥalabī.

Al-ʿUthaymīn, Muḥammad Ibn Ṣāliḥ Ibn Muḥammad. 1428H. *Ashsharḥul Mumtiʿu ʿAlā Zādil Mustaqnī*. 15 vols. Cairo: Dāru Ibnul Jawzī.

Al-Zubaydī, al-Sayyid Muḥammad Murtaḍa al-Ḥusaynī. 1391H. *Tājul ʿArūs*. Beirūt: Dāru Iḥyā al-Turāth al-ʿArabī.



Āmir, Wā´il Lutfī Ṣāliḥ ʿAbdullah. 2009. *Uqūbatul Ḥdāmi wa Mawqifut Tashrīʿil Jinā´iyyil Islāmi mihā: Dirāsah Muqāranah.* MA, Al-Fiqhu wa al-Tashrīʿ, Jāmiʿatun Najāḥ al-Waṭaniyyah.

Āmir, ʿAbdul ʿAzīz. 2012. Al-Taʿzīru fish Sharīʿatil Islāmiyyah. Dhaka: Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Cernter.

Ara, Mst. Jesmin, Md. Fakhar Uddin, and Md. Hasan Kabir. 2016. "The causes of Suicide and Impact of Society in Bangladesh." *International Research Journal of Social Sciences* 5 (3):25-35.

Arafat, S. M. Yasir. 2017. "Suicide in Bangladesh: A Mini Review." *Journal of Behavioral Health* 6 (1):66-69. doi: 10.5455/jbh.20160904090206.

ʿAwdah, ʿAb dul Qādir. 2010. *Al-Tashrīʿul Jinā´il Islāmī Muqārinan bil Qānūnil Waḍʿī*. 1st ed. Beirūt: Dārul Kitābil ʿArabī.

Duderija, Adis. 2014. *Maqasid al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*: Springer.

Durkheim, Emile and George Simpson. 1952. *Suicide: A Study in Sociology. Transl. by John A. Spaulding and George Simpson*: Routledge & Kegan Paul.

Ghayẓān, Yūsuf ʿAlī Maḥmūd. 1995. *ʿUqūbatul Qatli fish Sharīʿatl Islamiyyah*. 1st ed. Beirūt: Dārul Fikr.

Ginges, Jeremy, Ian Hansen and Ara Norenzayan. 2009. "Religion and support for suicide attacks." *Psychological science* 20 (2):224-230.

Gipson, Bruce Yasin. 2012. *Maqasid al-Shari'ah as a Methodology for Tajdid: A Return to the Spirit of the Qur'an and the Sunnah of His Messenger (Saas).* Temple University Libraries.

Haykal, Muḥammad Khayr. 2008. *Al-Jihādu wal Qitālu fis Siyāsatish Sharʿiyyah*. Beirūt: Dāru Ibn Ḥazm.

Ibn Fāris, Abul Ḥusayn Aḥmad. 1970. *Maqāyis al-Lughah.* Cairo: Maṭbaʿat al-Bābī al-Ḥalabī.

Ibn Ḥajr, Aḥmad Ibn ʻAlī Abul Faḍl al-ʻAsqalānī Ibn. 1379H. *Fatḥul Bārī Sharḥu Ṣaḥīḥul Bukhārī*. Beirūt: Dārul Maʻrifah.

Ibn Manzūr, Abul Faḍl Jamāluddīn Ibn Mukram al-Miṣrī. 1992. *Lisānul ʻArab*. Beirūt: Dāru Ṣādir.

Ibn ʻĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. 2001. *Maqāṣid al-Sharīʻah al-Islāmiyyah*. Amman: Dārun Nafāʼis.

Ibn Qayyim, Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb Ibn Saʿad Shamsuddīn al-Jawziyyah. 1994. *Zādul Maʿād fī Hadyi Khayril ʻIbād*. 27th ed. 5 vols. Beirūt: Muʼassasatur Risālah.

Ibn Qayyim, Shamsuddīn Abū ʻAbdullāh Muḥammad al-Jawziyyah. 1998. *Iʻlāmul Muwaqqiʻīn ʻan Rabbil ʻĀlamīn*. Riyāḍ: Dārul Muyassar.

Ibn Qudāmah, ʿAbdullāh Ibn Aḥmad. 1968. *Al-Mughnī*. Beirūt: Dāru ʿĀlamil Kutub.

Ibn Taymiyyah, Taqiyyuddīn Abul ʿAbbas Aḥmad Ibn ʿAbdul Ḥalīm al-Ḥarrānī. 2005. *Majmūʿul Fatāwā.* 3rd ed. Iskandariyyah: Dārul Wafā.

Ibnul Athīr, Majduddīn Abus Saʻādāt al-Mubārak Muḥammad al-Jazarī. 2002*. Al-Nihāyah fī Gharībil Ḥadīthi wal Athār*. Beirūt: Dārul Kutubil ʻIlmiyyah.

Iḥmīdān, Ziyād Muḥammad. 2008. Maqāṣidush Sharīʻatil Islāmiyyah. 1st ed. Beirūt: Muʼassasatir Risālah.

Johnston, David. 2004. "*A Turn in the Epistemology and Hermeneutics of Twentieth Century U· ūl al-Fiqh*." Islamic Law and Society 11 (2):233-282.

Khuzaym, Muḥammad ʻAbdussalām Kāmil Abū. 2010. "Ḥaṣānatun Nafsi fish Sharīʻatil Islāmiyyati wa Wathāʼiqi Ḥuqūqil Insān." *22 nd Conference of Maqāṣidush Sharīʻah wa Qaḍayal ʻAṣr,* Cairo, Egypt, 22-25 February.

Mālī, Ibrāhīm Kutāw. 2010. *"al-Qiṣāṣu fish Sharīʻatil Islāmiyyati (ʻUqūbatul Iʻdām) baynal Iqrāri wal Ilghāʼ*." Higher Council of Islamic Affairs, The Ministry of Awqaf of Egypt, Hama, Syria, 22-25 February.



Monawer, Abu Talib Mohammad. 2017. "Sharia Maqasider Tattik Bikash: Ekti Oitihashik Bisleshon." *Islami Ain O Bichar* 13 (51 & 52):51-86.

Muslim, Ibn al-Ḥajjāj Abul Ḥasan al-Qushayrī al-Naysābūrī. 1991. Al-Musnaduṣ Ṣaḥīḥu. Muḥammad Fuʼād ʿAbdul Bāqī ed. Beirūt: Dāru Iḥyā al-Turāthil ʿArabī.

Opwis, Felicitas. 2010. *Maslaha and the purpose of the law : Islamic discourse on legal change from the 4th/10th to 8th/14th century*. Leiden ; Boston: Brill.

Opwis, Felicitas. 2016. Maqāṣid al-Sharīa and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination, edited by Adis Duderija, 2014. *Islamic Law and Society* 23 (1-2):141-146.

Riḍā, Muḥammad Rashīd. 1994. *Tafsīrul Manār*. 2nd ed. 12 vols. Cairo: Dārul Manār.

Shay, Shaul. 2017. *The Shahids: Islam and suicide attacks Abingdon*: Routledge.

Wahhāb, Būʻ Azīz ʻAbdul. 2008. *Uqūbatul Iʻdāmi baynat Tashrīʿil Islāmī wal Qānūnil Waḍʻī: Dirāsah Muqāranah*. MA, Al-Qānūnul Khāṣ, Badji Mokhtar Annaba-University;